মিসির আলির চশমা

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. অদ্ভুত এক যন্ত্র. 2
২. চিঠিকন্যা শায়লা. 39
৩. মানুষের গল্প বলার Style 54
৪. পেতেছি সমুদ্রে শয্যা. 73
৫. ভূতবিষয়ক প্রবন্ধ 88
৬. ডিনারের নিমন্ত্রণ. 100

১. অদ্ভুত এক যন্ত্র

অদ্ভুত এক যন্ত্র।

যন্ত্রে বাটির মতো জায়গা, বাটিতে থুতনি রেখে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে হয়। যন্ত্রের ভেতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে তীব্র আলো এসে চোখের ভেতর ঢুকে যায়। তখন বুকের ভেতর ধক করে ওঠে। মনে হয় কেউ একজন তীক্ষ্ণ এবং লম্বা একটা সুচ চোখের ভেতর দিয়ে মগজে ঢুকানোর চেষ্টা করছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার কথা। শেষ হচ্ছে না, কারণ ডাক্তার সাহেবের কাছে টেলিফোন এসেছে। তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন। মিসির আলি বুঝতে পারছেন না, তিনি কি বাটি থেকে থুতনি উঠিয়ে নেবেন? নাকি যেভাবে বসে আছেন সেভাবেই বসে থাকবেন? নড়ে গেলে যন্ত্রের রিডিংয়ে গণ্ডগোল হতে পারে। তখন হয়তো আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। হিন্দিতে যাকে বলে—ফির পেহলে সে।

মিসির আলি নড়লেন না। ডাক্তার সাহেবের টেলিফোন আলাপ বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ডাক্তার সাহেবের নাম হারুন অর রশীদ। নামের শেষে অনেকগুলো অক্ষর আছে। মনে হয় বিদেশের সব ডিগ্রিই তিনি জোগাড় করে ফেলেছেন।

ডাক্তার সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবার কথা। চুলে পাক ধরে নি, তবে দুই চোখের ভুরুর বেশ কিছু চুল পাকা। চিমটা দিয়ে ভুরুর পাকা চুলগুলো তুলে ফেললে তার বয়স আরো কম লাগত।

ভদ্রলোক বেঁটে। ভারী শরীর। গোলাকার মুখ। চোখের দৃষ্টিতে সারল্য আছে, তবে ভুরু ঝোপের মতো বলে দৃষ্টির সারল্য চোখে পড়ে না। তিনি ঝকঝকে সাদা অ্যাপ্রন পরে আছেন। অ্যাপ্রনটা তাঁকে মানিয়েছে। বেশিরভাগ ডাক্তারের গায়ে অ্যাপ্রন মানায় না।

ডাক্তার হারুন। এখন চরম রাগারগি শুরু করেছেন। তার কথা শোনা যাচ্ছে, ওপাশের কথা শোনা যাচ্ছে না। মিসির আলির ধারণা ওপাশে টেলিফোন ধরেছেন হারুন সাহেবের স্ত্রী। রাগারাগির ধরনটা সেরকম। ডাক্তার সাহেবের গলার স্বর ভারী এবং খসখসে। তাঁর চিৎকার এবং হইচই শুনতে ভালো লাগছে।

ডাক্তার। আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। এই জিনিসটা আমার পছন্দ না। একেবারেই পছন্দ না।

(ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলল।)

ডাক্তার : খবরদার পুরোনো প্রসঙ্গ তুলবে না।।

(ওপাশের কথা।)

ডাক্তার : কী। আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছ? আরেকবার এই কথাটা বল তো? একবার শুধু বলে দেখ।

মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আরেকবার এই কথাটি বললেন।

ডাক্তার : চিৎকার করছি? আমি চিৎকার করছি? আমি এক পেশোস্ট্রের চোখ পরীক্ষা করছি। তুমি খুব ভালো করে জানো পেশেন্টের সামনে আমি চিৎকার চেঁচামেচি করি না। শাট আপ, শাট আপ বললাম। Yes, I say shut up and go to hell.

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি এখনো এইভাবে বসে আছেন কী জন্য? আপনার চোখ দেখা তো শেষ।

মিসির আলি বললেন, পরীক্ষা শেষ হয়েছে বুঝতে পারি নি। মাঝখানে আপনার টেলিফোন এল।

আপনার চোখ ঠিক আছে, শুধু প্রেসার হাই। গ্লুকোমা। একটা ড্রপ দিচ্ছি। ঘুমুবার আগে চোখে এক ফোঁটা করে দেবেন। ভুল করবেন না।

মিসির আলি বললেন, যদি ভুল করি তা হলে কী হবে?

ডাক্তার নির্বিকার গলায় বললেন, অন্ধ হয়ে যাবেন–আর কী।

অন্ধ হয়ে যাব?

হ্যাঁ। পনের দিন পর আবার আসবেন। ভালো কথা, আপনাকে ফি দিতে হবে না।

হারুন বললেন, আপনাকে আমি চিনি। আপনি বিখ্যাত মানুষ। আমি বিখ্যাত মানুষদের কাছ থেকে ফি নেই না। বিখ্যাত মানুষরা দশ জায়গায় আমার কথা বলেন। তাঁদের কথার অনেক গুরুত্ব। এতে পসার দ্রুত বাড়ে।

মিসির আলি বললেন, আপনি মনে হয় ভুল করছেন। আমাকে অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। আমি বিখ্যাত কেউ না। আমি অতি সাধারণ একজন।

হারুন ভুরু কুঁচকে বললেন, আপনার নাম কী?

মিসির আলি।

হারুন বললেন, তা হলে তো ভুলই করেছি। মেজর মিসটেক। আমি আপনাকে নাটক করে এমন কেউ ভেবেছি। চেহারা খুব পরিচিত লেগেছে। ভালো কথা, আপনি কি অভিনয় করেন? গত সপ্তাহে টিভিতে কী যেন একটা নাটক দেখলাম, আপনি সেখানে ছিলেন?

জি না।

অতি বোগাস এক নাটক। তারপরেও শেষ পর্যন্ত দেখেছি। নাটকের নামটা মনে পড়ছে না। ন দিয়ে নামের শুরু, এইটুকু মনে পড়ছে। আচ্ছা শুনুন, আপনি হাফ ফি দেবেন। আমার চারশ টাকা ফি, আপনি দু'শ দেবেন।

হাফ কেন?

প্রথমবার বাই মিসটেক ফ্রি বলেছিলাম। এইজন্য। আপনি আশা করে বসেছিলেন ফ্রি হয়ে গেছে। যখন দেখলেন হয় নি, তখন আশাভঙ্গ হয়েছে। হয়েছে কি না বলুন?

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বোঝা যাচ্ছে এই ডাক্তার বিচিত্র স্বভাবের। তার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলা ঠিক না। ফি দিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচা যেত। চোখের ড্রপের নামটা এখনো তিনি লিখে দেন নি।

হারুন ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল, জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনার আশাভঙ্গ হয়েছে না? মনটা খারাপ হয়েছে না?

সামান্য হয়েছে।

এই জন্যই ফি হাফ করে দিলাম।

প্রেসক্রিপশনটা লিখে দিলে চলে যেতাম।

হারুন কাগজ টেনে নিলেন। কলমদানি থেকে কলম বের করতেই আবার টেলিফোন। মনে হচ্ছে তাঁর স্ত্রী। কারণ ডাক্তার টেলিফোন ধরেই খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন।

তোমার প্রবলেমটা কী? রোগী দেখছি, এর মধ্যে একের পর এক টেলিফোন। আমাকে শান্তিমতো কিছু করতে দেবে না?

(ওপাশের কিছু কথা।)

সব সময় টাইম মেনটেন করা যায় না। রোগীর চাপ থাকে। ক্রিটিক্যাল কেইস থাকে। তর্ক করবে না। স্টপ তর্ক। স্টপ। যাও আজ আমি বাসাতেই যাব না। ক্লিনিকে থাকব। সোফায় ঘুমাব। যা ভাবছ তা-না। চেম্বারে কেউ শখ করে থাকে না।

হারুন টেলিফোন নামিয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি বসে আছেন কেন?

প্রেসক্রিপশনটার জন্য অপেক্ষা করছি। আই ড্রপ।

হারুন ড্রয়ার খুলে একটা প্যাকেট মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মেজাজ খুবই খারাপ। প্রেসক্রিপশন লিখতে পারব না। এটা নিয়ে যান। রাতে ঘুমাবার সময় এক ড্রপ করে দেবেন।

দাম কত?

দাম দিতে হবে না। ওষুধ কোম্পানি থেকে স্যাম্পল হিসেবে পাই। স্যাম্পলের ওষুধ বিক্রি করার অভ্যাস আমার নেই। দরিদ্র রোগীদের ফ্রি দিয়ে দেই।

ধন্যবাদ।

এক মাস পর আবার আসবেন।

আগে বলেছিলেন পনের দিন পর আসতে।

এখন বলছি, এক মাস পর।

জি অসব।

মিসির আলি উঠে দাড়াতেই ডাক্তার বললেন, একটু বসুন।

মিসির আলি বসে পড়লেন।

আপনি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন। এই জন্যই বসতে বলছি। আমার সঙ্গে চা খেয়ে তারপর যাবেন। এবং একটা বিষয় মনে রাখবেন, আমি ডাক্তার যেমন ভালো, মানুষ হিসেবেও ভালো। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সব জায়গায় হয়। এটা কিছু না। ভালো মানুষরা ঝগড়া করে। মন্দ মানুষের চেয়ে বেশিই করে।

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা নিয়ে যাচ্ছি। না। আপনি খুব ভালো ডাক্তার–এটা জেনেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি দামি একটা আই ড্রপ বিনা টাকায় আমাকে দিয়েছেন। এটা প্রমাণ করে যে, আপনি মানুষ হিসেবেও ভালো।

দামি আই ড্রপ বুঝলেন কীভাবে?

প্যাকেটের গায়ে লেখা, বার শ টাকা রিটেল প্রাইস।

আরে তাই তো! এত সহজ ব্যাপার মাথায় আসে নি।

মিসির আলি বললেন, এরকম হয়। মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং লজিক একসঙ্গে কাজ করে না।

হারুন আনন্দিত গলায় বললেন, নামটা মনে পড়েছে–নদীর মোহনা।

মিসির আলি বললেন, নাটকের নামটার কথা বলছেন?

জি। জি। নামকরণটা ভুল হল না? মোহনা তো নদীরই হবে? সমুদ্রের মোহনা হবে না। নাটকের নাম শুধু মোহনা রাখলেই হত। তাই না? কিংবা নদী নাম হলেও চলত। নায়িকার নাম নদী। লম্বা একটা মেয়ে, তবে তার চোখে মনে হয় সমস্যা আছে। সারাক্ষণ চোখ মিটমিট করছে। আমার কাছে এলে বিনা ভিজিটে চোখ দেখে দিতাম।

দরজা ফাঁক করে কে একজন উঁকি দিচ্ছে। তার চেহারায় ভয়। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, কী চাও?

স্যার, বাসায় যাবেন না?

না। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। সামছুকে বল, দুকাপ চা দিতে। চিনি আলাদা দিতে বলবে। লিকার যেন ঘন হয়।

সত্যি চলে যাব স্যার?

মিথ্যা চলে যাওয়া বলে কিছু আছে? গাধার মতো কথা। Get Lost, ম্যাডামকে গিয়ে বলবে, স্যার আজ আসবে না।

ভীত মানুষটা সাবধানে দরজা বন্ধ করল। বন্ধ করার আগে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, সব গাধা।

মিসির আলি বললেন, আমি কি আপনাকে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব? আপনি বাসায় চলে যান। আপনার স্ত্রী একা। উনার নিশ্চয় মনটা খারাপ আজ। আপনাদের একটা বিশেষ দিন। ম্যারেজ ডে।

কে বলেছে আপনাকে?

অনুমান করছি।

হারুন রাগী গলায় বললেন, আমি মিথ্যা পছন্দ করি না। আপনাকে কেউ নিশ্চয় বলেছে। অনুমান বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, আপনার অফিসে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ছবি আছে। বাচ্চাকাচার ছবি নেই। যিনি অফিসে স্ত্রীর ছবি রাখেন। তিনি বাচ্চাকাচার ছবিও অবশ্যই রাখেন। সেই থেকে অনুমান করছি, আপনাদের ছেলেমেয়ে নেই। আপনার স্ত্রী বাসায় একা।

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে এটা বুঝলেন কীভাবে?

আজ ছয় তারিখ। দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ঝুলছে সেখান ছয় তারিখটা লাল কালি দিয়ে গোল করা।

আমার স্ত্রী বা আমার জন্মদিনও তো হতে পারে।

মিসির আলি বললেন, আপনার জন্মদিন হবে না, কারণ নিজের জন্মদিন মনে থাকে। আপনার স্ত্রীর জন্মদিনও হবে না। স্ত্রীরা জন্মদিনে স্বামী দেরি করে বাড়ি ফিরলে তেমন রাগ করে না। ম্যারেজ ডে ভুলে গেলে বা সেই দিনে দেরি করে স্বামী ঘরে ফিরলে রাগ করে। তা ছাড়া গোল চিহ্নের ভেতর লেখা M. এটা ম্যারেজ ডের আদ্যক্ষর হওয়ার কথা।

হারুন বললেন, আপনি তো যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক।

মিসির আলি বললেন, খুব বুদ্ধিমান না। তবে কার্যকারণ নিয়ে চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে।

আপনি করেন কী?

আমি কিছুই করি না। অবসরে আছি।

আগে কী করতেন?

সাইকোলজি পড়াতাম।

আপনার কি কোনো কার্ড আছে?

জি না।

হারুন বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আমি আপনাকে চিনেছি। আপনাকে নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। আমার স্ত্রী আপনার বিশেষ

ভক্ত। M দিয়ে আপনার নাম, মেহের আলি বা এই জাতীয় কিছু। আপনার নামটা কী বলুন তো। আগে একবার বলেছিলেন। ভুলে গেছি। সরি ফর দ্যাট।

আমার নাম মিসির আলি।

আপনার কি টেলিফোন আছে?

সেল ফোন একটা আছে।

হারুন আগ্রহ নিয়ে বললেন, নাম্বারটা লিখুন তো। শয়লাকে দিব। সে খুবই খুশি হবে। আচ্ছা আপনি নাকি যে কোনো সমস্যার সমাধান চোখের নিমিষে করে ফেলেন, এটা কি সত্যি?

সত্যি না।

যে কোনো মানুষকে দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব বলে দিতে পারেন, এটা কি সত্যি?

সত্যি না।

শায়লা আপনার বিষয়ে যা জানে সবই তো দেখি ভুল।

মগভর্তি চা চলে এসেছে। আগের লোকই চা এনেছে। ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, ফজলু, তোমাকে না চলে যেতে বললাম? তুমি ঘুরঘুর করছ, কেন? Stupid. যাও সামনে থেকে। গাড়িতে বসে থাক।

স্যার কি বাসায় যাবেন?

যেতে পারি। এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। চা খেয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিব। এখন Get lost.

ফজলু চলে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন ফজলুর মুখ থেকে ভয়ের ছাপ কমেছে। তাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, চা ভালো হয়েছে। খান। বিস্কিট আছে। বিস্কিট দেব? ভালো বিস্কিট।

বিস্কিট লাগবে না।

হারুন সামান্য ঝুঁকে এসে খানিকটা গলা নামিয়ে বললেন, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, না।

হারুন আনন্দিত গলায় বললেন, আমিও না।

মিসির আলি বললেন, ভূতের প্রসঙ্গ এল কেন?

হারুন জবাব দিলেন না। তাঁকে এখন বিব্রত মনে হচ্ছে। মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেলে মানুষ যেমন বিব্রত হয় সেরকম। মিসির আলি বললেন, আপনি কি কখনো ভূত দেখেছেন?

হারুন ক্ষীণস্বরে বললেন, হুঁ।

মিসির আলি বললেন, একটু আগেই বলেছেন, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন না।

হারুন বললেন, ভূত দেখি নি। আত্মা দেখেছি। আত্মা। আমার মায়ের আত্মা। সেটাও তো এক ধরনের ভূত। তাই না?

ও আচ্ছা।

আমার সামনে যখন কোনো বড় বিপদ আসে, তখন আমার মায়ের আত্মা এসে আমাকে সাবধান করে।

তাই নাকি?

জি! আত্মার গায়ে যে গন্ধ থাকে এটা জানেন?

মিসির আলি বললেন, জানি না।

হারুন চাপা গলায় বললেন, গন্ধ থাকে। কেম্ফফরের গন্ধ। বেশ কড়া গন্ধ।

সব আত্মার গান্ধই কি ফেম্ফফরের? নাকি একেক আত্মার গন্ধ একেক রকম?

হারুন বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তো আত্মা শুঁকে শুঁকে বেড়াই না যে বলব কোন আত্মার গন্ধ কী? আমি শুধু আমার মার আত্মাকেই দেখি। তাও সব সময় না। যখন আমি বিপদে পড়ি তখন দেখি। তিনি আমাকে সাবধান করে দেন।

মিসির আলি বললেন, উনি শেষ কবে আপনাকে সাবধান করেছেন?

হারুন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাই। বলেই অপেক্ষা করলেন না। অ্যাপ্রন পর অবস্থাতেই দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন।

মিসির আলির কাপের চা এখনো শেষ হয় নি। চা-টা খেতে অসাধারণ হয়েছে। তার কি উচিত চা শেষ না করেই উঠে যাওয়া? এক এক ডাক্তারের চেম্বারে বসে চুকচুক করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়াও তো অস্বস্তিকর। হঠাৎ করে বাইরে থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেও তো বিরাট সমস্যা। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই কম। তারপরও সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রবাবিলিটির একটা বইয়ে পড়েছিলেন যে কোনো মানুষের হঠাৎ করে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

মিসির আলি চা শেষ করলেন। তাড়াহুড়া করলেন না, ধীরেসুস্থেই শেষ করে চেম্বার থেকে বের হলেন। গেটের কাছে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। গা থেকে অ্যাপ্রন খুলে ফেলেছেন বলে তাকে অন্যরকম লাগছে। ডাক্তারের হাতে সিগারেট। তিনি মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, গাড়িতে উঠুন। আপনাকে পৌঁছে দেই। আপনি থাকেন কোথায়?

মিসির আলি বললেন, আমি ঝিকাতলায় থাকি। আপনাকে পৌঁছাতে হবে না। আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব।

আপনাকে গাড়িতে উঠতে বলছি উঠুন। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসবেন।

মিসির আলি উঠলেন। এই মানুষটাকে না বলে লাভ হবে না। হারুন সেই শ্রেণীর মানুষ যারা যুক্তি পছন্দ করে না।

হারুন বললেন, ড্রাইভারের পাশের সিটে বসত্বে কি আপনার অস্বস্তি লাগছে?

না।

অস্বস্তি লাগা তো উচিত। আমি আরাম করে পেছনের সিটে বসব। আর আপনি ড্রাইভারের পাশে হেল্পারের মতো বসবেন, এটা তো এক ধরনের অপমান। আপনি অপমান বোধ ক্রছেন না?

মিসির আলি বুললেন, অপমান বোধ করছি না। তা ছাড়া গাড়ি ড্রাইভার চালাবে না, আপনি চালাবেন। এই ক্ষেত্রে আপনার পাশে বসাই শোভন।

গাড়ি আমি চালাব। আপনি বুঝলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যান নি। আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কারণ আপনি আমাকে আরো কিছু বলতে চান। সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে আপনার

পাশে বসাবেন এটাই স্বাভাবিক। আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়েছেন, সেখান থেকে ধারণা করেছি, গাড়ি অপনি চালাবেন।

হারুন হাই তুলতে তুলতে বললেন, ঠিকই ধরেছেন। আপনার বুদ্ধি ভালো। আমার বুদ্ধ নেই। স্কুলে আমার নাম ছিল হাবা হারুন। হারুন নামে কেউ আমাকে ডাকত না। সবাই ডাকত হাবা হারুন। কলেজে আমার নাম হল হাহা। হাবা থেকে হা এবং হারুন থেকে হা নিয়ে হাহা।

গাড়ি মিরপুর সড়কে উঠে এসেছে। রাত এগারটার কাছাকাছি। এখানে রাস্তায় ভিড়। গাড়ি চলছে। ধীরগতিতে। প্রায়ই থামতে হচ্ছে।

হারুন বিরক্ত হচ্ছেন না। ক্যাসেটে গান ছেড়ে দিয়েছেন। হিন্দি গান হচ্ছে! বয়স্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ টাইপ মানুষরা সাধারণত গাড়িতে হিন্দি গান শোনেন না। ইনি যে শুধু শুনছেন তা না, যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছেন। গানের সঙ্গে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে তালও দিচ্ছেন। মিসির আলি বললেন, আপনি আমাকে কিছু বলবেন?

হারুন বললেন, ভেবেছিলাম বলব। এখন ঠিক করেছি বলব না।

মিসির আলি বললেন, তা হলে আমাকে যে কোনো জায়গায় নামিয়ে চলে যান। আপনার দেরি হচ্ছে।

হারুন বললেন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কথা বলে গাড়িতে তুলেছি। এখন পথের মাঝখানে নামিয়ে দেব না।

মিসির আলি বললেন, পথে নামালেই আমার জন্য সুবিধা। কারণ আমি হোটেলে ভাত খেয়ে তারপর বাসায় যাব। বাসায় আমার রান্নার ব্যবস্থা নেই।

আমি আপনাকে বাসায় নামিয়ে দেব। সেখান থেকে আপনি যেখানে ইচ্ছা যাবেন। I keep my words.

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। অসময়ে চা খাওয়ার জন্য ক্ষুধা মরে গিয়েছিল। এখন আবার তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। কলিজা ভুনা খেতে ইচ্ছা করছে। ঝাল কলিজা ভুনা, সঙ্গে পেঁয়াজ কঁচামরিচ।

মিসির আলি সাহেব!

জি।

কোনো গন্ধ কি পাচ্ছেন?

এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ পাচ্ছি।

হারুন গান বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এয়ার ফ্রেশনারটার গন্ধ আপনার কাছে কেমন লাগছে?

মোটামুটি লাগছে। এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ আমার কখনোই ভালো লাগে না।

হারুন বললেন, আপনি কেস্ফরের গন্ধ পাচ্ছেন। গাড়িতে কোনো এয়ার ফ্রেশনার নেই। আমার মায়ের আত্মা আমাদের সঙ্গে আছে বলেই এই গন্ধ।

ও আচ্ছা।

আপনি খুব হেলাফেলা করে ও আচ্ছা বলেছেন। এটা ঠিক করেন নি। আমি সিজিওফ্রেনিক পেশেন্ট না। স্কুলজীবনে আমাকে হাবা হারুন বলা হলেও আমি হাবা না।

আপনার মা কি প্রায়ই আপনার সঙ্গে থাকেন?

যখন কোনো বড় বিপদ আমার সামনে থাকে তখন তিনি আমার সঙ্গে থাকেন।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি কোনো বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন?

করছি।

জানুতে পারি বিপদটা কী?

আমি খুন হয়ে যাব। কেউ একজন আমাকে খুন করবে। কে খুন করবে সেটাও আমি জানি। My mother told me.

মিসির আলি বললেন, তিনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন? নাকি স্বপ্নে বলেন?

হারুন বললেন, তিনি নানানভাবে আমার সঙ্গে কম্যুনিকেট করেন। মাঝে মাঝে স্বপ্নেও করেন।

আপনার মা কী বলেছেন? কে আপনাকে খুন করবে?

আপনি জেনে কী করবেন?

কৌতুহল থেকে প্রশ্ন করেছি। বলতে না চাইলে বলবেন না।

ডাক্তার গলা নামিয়ে বললেন, আমাকে খুন করবে। আমার স্ত্রী। ওর নাম শায়লা।

মিসির আলি বললেন, খুন কবে হবেন সেটা কি আপনার মা আপনাকে বলেছেন?

বলেছেন। তবে খুব নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। জন্ম-মৃত্যুর বিষয় নির্দিষ্ট করে আত্মারা কিছু বলতে পারে না। ওদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। আমার খুন হবার কথা আজ রাতে।

মিসির আলি ধাক্কার মতো খেলেন। একটা মানুষ ভাবছে সে রাতে খুন হবে। তারপরও স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চালাচ্ছে।

নানান কায়দাকানুন করে এই কারণেই বাসায় যাওয়া পেছাচ্ছি। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে কোনো একটা হোটেলে চলে যাব।

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মানুষটা মানসিকভাবে অসুস্থ। এতটা অসুস্থ তা শুরুতে বোঝা যায় নি।

হারুন বললেন, আমাকে কীভাবে মারবে জানতে চান?

কীভাবে?

বিষ খাইয়ে মারবে। বিষের নাম জানতে চান? পটাশিয়াম সায়ানাইড। পটাশিয়াম সায়ানাইডের নাম জানেন তো? KNC

নাম জানি। আপনার স্ত্রী পটাশিয়াম সায়ানাইড পাবেন কোথায়?

তার কাছে আছে। সে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যান। সে কী করবে জানেন? কোনো একটি খাবারে এই জিনিস মিশিয়ে দেবে।

আপনি কি আপনার আশঙ্কার কথা আপনার স্ত্রীকে জানিয়েছেন?

জানিয়েছি। তার ধারণা আমার প্যারানয়া হয়েছে। ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে আমার চিকিৎসা করা উচিত। এই কারণেই আপনাকে সে খুঁজছে।

মিসির আলি বললেন, আমাকে এইখানে নামিয়ে দিন। সামনের গলিতেই আমার বাসা।

হারুন বললেন, আপনাকে আপনার বাসার সামনে নামাব। আপনার বাসাটা চিনে আসব। আপনার আপত্তি নেই তো?

কোনো আপত্তি নেই।

আমার মাকেও আপনার বাসাটা চেনানো দরকার। প্রয়োজনে তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার মায়ের নাম সালমা রহমান।

মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করছে সালমা রহমান কি দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। হারুনুর রশীদ ডাক্তারের নাম। তাঁর বাবার নাম যদি রশীদ হয় তা হলে সালমা রহমান না হয়ে সালমা রশীদ নাম হবার কথা।

মিসির আলি বললেন, আপনার বাবার নাম জানতে পারি?

কেন?

কৌতুহল।

আমার বাবার নাম আবদার রশীদ।

আপনার বাবা কি জীবিত?

বাবা মারা গেছেন।

আপনার মা কি দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন?

হারুন বিরক্ত গলায় বললেন, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমি পছন্দ করি না। আমার মাও পছন্দ করেন না। Like mother like son.

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার সাইকিয়াট্রিস্ট, সেই কারণেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি।

হারুন বললেন, আপনি আমার সাইকিয়াট্রিস্ট না। আপনি আমার একজন রোগী। ভদ্রতা করে আমি যাকে বাসায় নামিয়ে দিচ্ছি।

মিসির আলি বললেন, এই সামনে গাড়ি রাখুন। ডানদিকের ফ্লাটবাড়ির একতলায় আমি থাকি। আপনি কি নামবেন?

না।

আপনি বলেছিলেন আপনার মাকে আমার যাস চিনিয়ে দেবেন।

হারুন রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে দরজা খুলে নামলেন। তাঁর চোখে ভরসা হারানো মানুষের দৃষ্টি। যে মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। তার কী করা উচিত।

মিসির আলির বসার ঘরের বেতের চেয়ারে ডাক্তার হারুন বসে আছেন। তাঁকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়বেন। তাঁর মাথা ঝুলে আছে। থুতনি বুকের সঙ্গে প্রায় লাগানো। তাঁর চোখ খোলা, তবে ঘুমন্ত মানুষের নাক দিয়ে যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ হচ্ছে।

হঠাৎ আওয়াজু বন্ধ হল। হারুন মাথা তুলে বললেন, আপনি একা থাকেন?

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হারুন বললেন, আপনার বাসায় কি এক্সট্রা বেড আছে?

মিসির আলি বললেন, নেই।

এক্সট্র বেড থাকলে আপনার এখানেই থেকে যেতম। হোটেলে যেতাম না। আমার মায়ের আপনার বাসা পছন্দ হয়েছে। তিনি পুরো বাড়ি ঘুরে দেখেছেন।

মিসির আলি বললেন, এখন কি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন?

হুঁ।

এই মুহুর্তে তিনি কোথায়?

আপনার শোবার ঘরে।

মিসির আলি বললেন, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে। ঘড়িতে কটা কাজে তিনি বলতে পারবেন?

হারুন বললেন, আপনি পরীক্ষা করে দেখছেন মায়ের ব্যাপারটা আমার মনের কল্পনা কি না, ঠিক বলেছি?

ঠিক বলেছেন। এই পরীক্ষা আপনার মনের শান্তির জন্যও প্রয়োজন।

হারুন বললেন, আত্মা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই। দেহধারী মানুষ এবং আত্মা এক না। আত্মা জাগতিক পৃথিবী ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। জাগতিক পৃথিবী তাদের কাছে অস্পষ্ট। গাঢ় কুয়াশার জগৎ। আত্মা প্রবল আকর্ষণের কারণে তার অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে। কিন্তু জগৎ সম্পর্কে কিছুই জালে মন।

মিসির আলি বললেন, তার মানে কি এই যে আপনার মা আমার শোবার ঘরের ঘড়িতে কয়টা বাজে বলতে পারবেন না?

বলতে না পারার কথা। তারপরেও তাঁকে জিজ্ঞেস করব।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি চা খাবেন? কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে দেই?

না, আমি উঠব।

হারুন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, মা আমাকে জানিয়েছেন–আপনার শোবার ঘরের দেয়ালে কোনো দেয়ালঘড়ি নেই।

মিসির আলি ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁর শোবার ঘরের দেয়ালে কোনো ঘড়ি নেই। কখনো ছিল না। অনেকদিন থেকেই তিনি ভাবছিলেন একটা দেয়ালঘড়ি কিনবেন। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই যেন সময় দেখতে পারেন।

মিসির আলি ডাক্তারকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন। হারুন সাহেবের একটা বিষয়ে তিনি অবাক হচ্ছেন, এই মানুষটা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি–দেয়ালঘড়ি আসলেই কি নেই? খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। অস্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক প্রশ্ন করে না।

ডাক্তার হারুন বাড়ি পৌঁছলেন রাত একটা দশে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় তিনি গেটের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগালেন। বাম্পারের একটা অংশ ঝুলে পড়ল। গাড়ি গ্যারেজে ঢোকানোর সময়ও গ্যারেজের দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। পরপর দুটি অ্যাকসিডেন্টই হারুন সাহেবের স্ত্রীর চোখের সামনে ঘটল। তিনি বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন। তার চোখে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা। বারান্দার বাতি নেভানো। বাইরে থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি আজ সুন্দর করে সেজেছেন। কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছেন। কপালে টিপ দিয়েছেন। তাঁর নাকের হীরের নাকফুল এই অন্ধকারেও ঝকমক করছে।

হারুন বারান্দায় ঢুকতেই শায়লা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হ্যালো।

হারুন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ।

বলেই তিনি দরজার দিকে এগুলেন। শায়লা বললেন, দুটা মিনিট বারান্দায় বস। ঠাণ্ডা হও, তারপর ঘরে যাবে।

হারুন কথা বাড়ালেন না। স্ত্রীর সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। শায়লা বললেন, লাচ্ছি বানিয়ে রেখেছি। লাচ্ছি খাও।

হারুন টেবিলের দিকে তাকালেন। দু'টা গ্লাসে লাচ্ছি। গ্লাস পিরিচ দিয়ে ঢাকা। শায়লা একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন। হারুনের ভ্রূ কুঁচকে গেল। পটাশিয়াম সায়ানাইড নামক

ভয়ংকর বিষ কি এই গ্লাসেই মেশানো? তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বারান্দার অল্প আলোয় শায়লার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

লাচ্ছি খাব না।।

শায়লা বললেন, বিয়ের দিন লাচ্ছি খাওয়া আমাদের অনেক দিনের রিচুয়াল। প্লিজ। গ্লাসে চুমুক দাও।

হারুনের ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। শিরশির করছে। এত সাধাসাধি করছে কেন? আজই কি তা হলে সেই বিশেষ দিন?

শায়লা বললেন, আজ সারা রাত আমরা ঘুমাব না। গল্প করব। বিয়ের রাতটা যেভাবে গল্প করে কাটিয়েছি। তোমার মনে আছে না?

হুঁ।

রাত তিনটার সময় কে দুগ্লাস লাচ্ছি নিয়ে দরজা ধাক্কা দিল তোমার মনে আছে?

হুঁ।

হুঁ হুঁ না করে তাঁর নামটা বল। দেখি তোমার স্মৃতিশক্তি কেমন।

তোমার ভাবি লাচ্ছি এনেছিলেন।

গুড। তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো লাচ্ছিটা খাও। আমি অনেক যত্ন করে বানিয়েছি।

হারুন। একবার ভাবলেন হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমার হাতের লাচ্ছিটা আমাকে দাও। আমারটা তুমি খাও। যুক্তি দিয়ে বললে সে সন্দেহ করবে না। বললেই হবে তোমার হাতের গ্লাসটা বেশি পরিষ্কার। ঐ গ্লাসটা দাও।

শায়লা বললেন, কী হল! চুমুক দাও।

অবিশ্যি জেনেও কোনো লাভ নেই। তিনি কাউকে বলে যেতে পারবেন না, একটা তের মিনিট একুশ সেকেন্ড সময়ে তিনি মারা গেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই হারুন গ্লাসে চুমুক দিলেন। সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে। একুশ সেকেন্ড থেকে হল তেইশ সেকেন্ড। এখন হল পঁচিশ সেকেন্ড।

কী দেখছ?

কিছু দেখছি না।

লাচ্ছিটা খেতে ভালো হয়েছে না?

হুঁ।

বিয়ের রাতের মতো হয়েছে?

হুঁ।

এই লাচ্ছিষ্টার দৈ ঘরে পাতা।

হুঁ।

তুমি দেখি হুঁ হুঁ করেই যাচ্ছ। ভালো কথা, তুমি চায়ের মতো চুকচুক করে খাচ্ছ কেন? একটানে শেষ কর।

হারুন একটানে গ্লাস শেষ করলেন। ঘড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মৃত্যু হলে এতক্ষণে হয়ে যেত। শায়লা বললেন, আমি বাথটাব পানি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছি। তুমি আরাম করে সময় নিয়ে গোসল করবে। তারপর আমরা একসঙ্গে।

আমি খেয়ে এসেছি।

কোথায় খেয়ে এসেছ?

এক পেশেন্টের বাসায় গিয়েছিলাম। পেশেন্ট জোর করে খাইয়ে দিয়েছে।

মেনু কী ছিল?

কৈ মাছের ঝোল আর আর...

আর কী?

ইলিশ মাছ ভাজা।

আরাম করে খেয়েছে?

হুঁ।

শায়লা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কৈ মাছের কাটার জন্য রাতে তুমি কৈ মাছ খাও না। ইলিশ মাছ খাও না গন্ধ লাগে এই কারণে। আজ এই দুই নিষিদ্ধ বস্তুই খেয়ে এসেছ? তাও তোমার এক পেশেন্টের বাড়িতে। যেখানে তুমি জানো আজ আমাদের ম্যারেজ ডে। বাসায় বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানো না?

জানি।

তুমি কি সত্যি খেয়ে এসেছ?

না।

শায়লা বললেন, মিথ্যা কথাটা কেন বলেছ। আমি জানি না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কারণ জানতে চাচ্ছি না। আমি আজ কোনো কিছু নিয়ে হইচই করব না। ঝগড়া করব না।

হারুন বললেন, তুমি তো কখনোই হইচই কর না। ঝগড়া কর না।

তা ঠিক। মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছা করে। আজ রাতে টেলিফোন করে সিরিয়াস ঝগড়া করেছি না? এরকম আর হবে না। উঠ তো, গোসল করবে।

হারুন উঠে দাড়ালেন। শায়লা বললেন, বিল দেখি আজ রান্না কী?

আমার পছন্দের কোনো আইটেম।

হয়েছে। কলিজা ভুনা, খিচুড়ি।

থ্যাংক য়্যু। পেঁয়াজ কুচি করে ভিনেগারে দিও। কলিজা ভুনার সঙ্গে ভিনেগার মেশানো পেঁয়াজ ভালো লাগে।

শায়ালা বললেন, দেয়া আছে! তোমার আরেকটা অতিপ্রিয় খাবারও আছে। ঘিয়ে ভাজা শুকনা মরিচ।

থ্যাংক য়্যু এগেইন।

বাথটাবের পানিতে গা ডুবিয়ে হারুন শুয়ে আছেন। পানি শীতল। পানির শীতলতা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আরামদায়ক অভিজ্ঞতা। হারুনের হাতে বিয়ারের ক্যান। বিয়ারের ক্যানের উত্তাপ হিমাঙ্কের কাছাকাছি। ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে ভালো লাগছে। স্নায়ু ঝিমিয়ে পড়ছে। স্নায়ুকে অলস করে দেয়াটাও আনন্দময় প্রক্রিয়া।

স্নানের সময় বরফশীতল বিয়ারের ক্যানে চুমুক দেয়ার অভ্যাস তিনি বিলেতে আয়ত্ত করেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হয়, বিদেশে যে অল্পকিছু ভালো অভ্যাস তিনি করেছেন এটা তার একটা।

হারুন।

হারুন চমকে উঠলেন। তাঁর মার গলা। এই গলা বিয়ারের ক্যানের মতোই শীতল। এমনভাবে চমকালেন যে বিয়ারের ক্যান তাঁর হাত ফসকে বাথটাবের পানিতে পড়ে গেল। ক্যানটা তিনি অতি দ্রুত তুলে ফেললেন। তার আগেই অনেকখানি পানি ক্যানে ঢুকে গেল।

হারুন।

জি মা।

তুই পীরবংশের ছেলে, এটা জানিস? তোর বাবার দাদা হুজুরে কেবলা ইরফানুদ্দীন কুতুবি কত বড় পীর ছিলেন সেটা জনিস?

কিছু কিছু জানি। তুমি বলেছ।

তুই এত বড় পীরের পুতি! আর তুই কিনা নেংটো হয়ে মদ খাচ্ছিস?

হারুন হাত বাড়িয়ে টাওয়েল নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে বললেন, বিয়ার মদ না মা! ইউরোপ আমেরিকায় পানির বদলে এই জিনিস খাওয়া হয়। অ্যালকোহলের পরিমাণ পাঁচ পার্সেন্টেরও নিচে।

চুপ।

হারুন চুপ করে গেলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। মুখ শুকিয়ে আসছে।

হারুন! বাতি নিভিয়ে দে।

বাতি নেতালে আমার ভয় লাগবে মা।

লাগুক ভয়। বাতি নেভা। আলোর মধ্যে থাকতে পারছি না। বিয়ারের ক্যান এখনো হাতে ধরে আছিস কেন? ফেলে দে।

হারুন ক্যান রেখে উঠে দাড়ালেন। বাতি নেভালেন। বাথরুম হঠাৎ অন্ধকারে ডুবে গেল। হারুন কঁপা কঁপা গলায় বললেন, মা ভয় লাগছে।

ভয়ের কী আছে? আমি আছি না!

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

আমাকে দেখিবি কী করে গাধা? কথা যে শুনতে পাচ্ছিস এই যথেষ্ট।

মা, তুমি তো কথাও ভুলভাল বল।

কখন ভুলভাল কথা বললাম?

তুমি বলেছিলে আজ রাতে বিষ খাওয়াবে। খাওয়ায় নি তো।

রাত কি শেষ হয়েছে?

তুই কত বড় গাধা বুঝতে পারছিস?

ডিনারের সময় বিষ দেবে মা?

তোকে কিছুই বলব না।

মা। মা।

তোয় কথা শুনতে পাচ্ছি। মা মা করতে হবে না। কী বলতে চাস বল।

আমার একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে তুমি আসলে আমার মনের কল্পনা।

আমি কল্পনা?

হুঁ। এক ধরনের অসুখ আছে যে অসুখে রোগীর হেলুসিনেশন হয়। সে কথা শুনতে পায়। নানান কিছু দেখে।

তোর ধারণা তোর সেই অসুখ হয়েছে?

হুঁ।

রোগ বাঁধিয়ে ঘরে বসে আছিস কেন? চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

করব।

আজ যে গাধাটার কাছে গিয়েছিলি সে-ই কি তোর চিকিৎসা করবে?

এখনো ঠিক করি নি।

দেরি করছিস কেন, ঠিক করে ফেল। সেও গাধা তুইও গাধা। গাধার চিকিৎসা তো গাধাই করবে।

আমাকে গাধা বলছ বল। উনাকে কেন গাধা বলছ?

যে বলে যুক্তির বাইরে কিছু নেই তাকে গাধা বলব না তো কী বলব? ছাগল বলবি? এটাই ভালো—সে ছাগল তুই গাধা। গাধা শোন, রাতে খেতে গিয়ে দেখবি কলিজা ভুনা দুটা প্লেটে রাখা। একটা তোর জন্য একটা তার জন্য। তোরটায় বিষ দেয়া। যা বলার আমি বলে দিলাম। এখন বাতি জ্বালা। তোর বউ এক্ষুনি তোকে খেতে ডাকবে। যদি দেখে বাতি নেভানো তা হলে নানান প্রশ্ন করবে।

হারুন বাতি জ্বালালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাথরুমের দরজায় টোকা পড়ল। শায়ালা বললেন, এই এতক্ষণ লাগাচ্ছে কেন? টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। সব তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হারুন খেতে বসেই বললেন, কলিজা ভুনা দুটা বাটিতে কেন?

শায়লা বললেন, তোমারটায় ঝাল দিয়েছি। আমি ঝাল খেতে পারি না বলে আমারটা আলাদা।

ঝাল খাওয়া তো আমিও ছেড়ে দিয়েছি।

কবে ছাড়লো?

হারুন আমতা-আমতা করছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শায়লা বললেন, তুমি ঝাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। এই তথ্য জানতাম না। এইমাত্র জানলাম। এখন থেকে সবকিছুই কম ঝালে রান্না হবে। আজ খেয়ে ফেল। প্লিজ।

শায়লা স্বামীর প্লেটে কলিজা ভুনা তুলে দিলেন।

হারুন খাচ্ছেন। খেতে অসাধারণ হয়েছে। ভিনেগার দেয়া পেঁয়াজের কারণে কলিজা ভুনার স্বাদ দশগুণ বেড়ে গেছে। হারুন ঘড়ি দেখলেন। ছয় মিনিট ধরে খাচ্ছেন। পটাশিয়াম সায়ানাইড দেয়া থাকলে অনেক আগেই কর্ম কাবার হয়ে যেত। মা আবারো ভুল করলেন।

খাবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড দেয়া থাকলে মন্দ হত না। এক ধাক্কায় সব ঝামেলা থেকে মুক্তি। মৃত্যুর পর মায়ের মতো আত্মা হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানো। হারুন ঠিক করলেন আত্মা হতে পারলে তিনি মাঝে মাঝে শায়লাকে ভয় দেখাবেন। ধরা যাক সে ক্লাস নিচ্ছে, হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিংবা রাতে শায়লা যখন ঘুমুবে তিনি তার পায়ের বুড় আঙুল কামড়ে ধরবেন। আত্মারা কি কামড়াতে পারে? মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

কী ভাবছ?

কিছু ভাবছি না।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছু নিয়ে চিন্তা করছ।

হারুন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আত্মা নিয়ে চিন্তা করছি। Soul.

ও আচ্ছা।

আত্মার প্রপার্টি নিয়ে ভাবছি। তবে সমস্যা হচ্ছে আত্মা কোনো বস্তু না, পরা বস্তু। পরা বস্তুর ধর্ম পৃথিবীর বিজ্ঞান ধরতে পারবে না।

শায়লা বললেন, তুমি কি ভালো একজন ডাক্তার দেখাবে? একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।

দেখাব। মিসির আলি সাহেবকে দেখাব। উনার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে।

সত্যি?

শায়লা, তুমি জানো আমি মিথ্যা কথা বলি না। জানো না?

জানি।

হারুনের খাওয়া শেষ হয়েছে। পানি খাওয়া দরকার। পানির গ্রাসের দিকে হাত বাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নিলেন। তার মন বলছে পানির গ্লাসেই মেশানো আছে ভয়ঙ্কর KCN. অবশ্যই পানির গ্লাসে মেশানো। পানি হবে বর্ণহীন। এই গ্রাসের পানি নীলচে।

২. চিঠিকন্যা শায়লা

মিসির আলি কুরিয়ারে একটা দীর্ঘ চিঠি পেয়েছেন। চিঠির প্রেরকের নাম শায়লা রশিদ। পুনশ্চতে লেখা— ড. হারুন রশিদ নামে যে চোখের ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন। আমি তাঁর স্ত্রী। দশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি, এক বৈঠকে লেখা এটা বোঝা যাচ্ছে। চিঠি লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে আবার লিখতে বসলে শুরুর লেখায় টানা ভাব কমে যায়। লেখার গতি কমে যায় বলেই এটা হয়।

চিঠি না পড়েই মিসির আলি পত্র লেখিকার বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন।

(ক) মহিলা ধৈর্যশীলা। যিনি এক বৈঠকে এত বড় চিঠি লিখবেন, তার ধৈর্য থাকতেই হবে।

(খ) মহিলা শান্ত। তাঁর মধ্যে অস্থিরতা নেই। মানসিক অস্থিরতার ছাপ লেখায় চলে আসে। এই মহিলার হাতের লেখায় অস্থিরতা নেই।

(গ) মহিলা অত্যন্ত গোছানো। কারণ তিনি চিঠি লেখার সময় বাংলা ডিকশনারি পাশে নিয়ে বসেছেন। ভুল বানান ডিকশনারি দেখে শুদ্ধ করেছেন।

(ঘ) মহিলা বুদ্ধিমতী। কারণ তিনি ব্যবস্থা করেছেন যেন মিসির আলি পুরো চিঠি পড়েন। সম্বোধনেই সেই ব্যবস্থা করা। মহিলা মিসির আলিকে 'বাবা' সম্বোধন করেছেন। 'বাবা' সম্বোধনে লেখা চিঠি অগ্রাহ্য করা কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব না। মেয়েদের পক্ষে 'মা' সম্বোধনের চিঠি অগ্রাহ্য করা। খুবই সম্ভব। তারা নানানভাবে। মা' ডাক শুনে অভ্যস্ত।

পুরুষরা ‘বাবা’ শুনে অভ্যস্ত না। কেউ বাবা ডাকলেই সেই ডাক পুরুষদের মাথার ভেতর ঢুকে যায়।

মিসির আলি চিঠি পড়তে শুরু করলেন। তাঁর হাতে একটা লাল কালির বল পয়েন্ট। চিঠির কোনো কোনো জায়গা লাল কালি দিয়ে। আন্ডার লাইন করতে হবে বলে তাঁর ধারণা। এই কাজটা
প্রথম পড়াতেই শেষ হয়ে যাওয়া ভালো।

প্রিয় বাবা,

আমার বিনীত সালাম নিন।
মিসির আলি লাল কালি দিয়ে প্রিয় বাবা আন্ডার লাইন করলেন।

সম্বোধন পড়ে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন। একজন চিরকুমার মানুষের কন্যা থাকার কথা না। কন্যাস্থানীয়া অনেকেই থাকবে, তারা বাবা। ডাকবে না। চাচা ডাকবে কিংবা আধুনিক কেতায় আংকেল ডাকবে। আপনাকে আমি কেন বাবা ডাকছি তা অন্য কোনো দিন। ব্যাখ্যা করব।

মিসির আলি আবারো লাল কালি দিয়ে দাগ দিলেন। ‘অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করব’ এই বাক্যের নিচে দাগ পড়ল।

আপনি অনেকের অনেক জটিল সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। আমি আপনাকে অতি জটিল একটা সমস্যা দিচ্ছি। সমস্যার ব্যাখ্যা আমি নিজে নিজে বের

করেছি। ব্যাখ্যা ঠিক আছে কি-না। তা শুধু আপনি বলে দিবেন। এই দীর্ঘ চিঠিতে আমি শুধু সমস্যাটি বলব। ব্যাখ্যায় যাব না। আপনি রহস্য সমাধানের পর আমি আমার সমাধান বলব।

আপনার সঙ্গে 'রহস্যসমাধান' খেলা আমি খেলতে পারি না। আমার ধৃষ্ঠতা ক্ষমা করবেন। যাই হোক, এখন। সমস্যাটি বলি।

অল্পবয়সে আমার বাবা-মা দু'জনই মারা যান। আমি বড় হই আমার ছোট চাচার আশ্রয়ে। চাচা-চাচি দু'জনই মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। আমার বাবা-মা নেই, এটা তাঁরা কোনোদিনই বুঝতে দেন নি। ছোট চাচিকে আমি চাচি না ডেকে সবসময়ই মা ডেকেছি। চাচাকে। বাবা ডাকতে শুরু করেছিলাম। চাচা ডাকতে দেন নি।

মিসির আলি লাল কলমে পুরো প্যারাটা দাগ দিলেন। তার ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হলো। মেয়েটি তাঁকে কেন বাবা সম্বোধন করেছে তা মনে হয় পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। সে নিজের বাবাকে বাবা ডাকতে পারে নি। চাচাকে ডাকতে গিয়েছিল, অনুমতি পায় নি। কাউকে বাবা ডাকার তীব্র ইচ্ছা থেকেই কি বাবা সম্বোধন?

আমার চাচা-চাচি অনেক যাচাই-বাছাই করে আদর্শ এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। পাত্র আদর্শ, কারণ তার চেহারা রাজপুত্রের মতো। আফ্রিকান কালো রাজপুত্র না, গ্রিক রাজপুত্র। আর্য সন্তান। আপনি তো আমার স্বামীকে দেখেছেন। বলুন সে রাজপুত্র না? এখন অবশ্যি চিন্তায় ভাবনায় চোখের নিচে কালি জমেছে। মাথায় টাক পড়েছে। মন্ত্রীপুত্র টেকো হলেও মানিয়ে যায়। টাক মাথার রাজপুত্র মানায় না।

যাই হোক, আমার রাজপুত্র ডাক্তার। পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায়। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। চোখের কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্টের একটি বিশেষ অপারেশন তাঁর আবিষ্কার। মেডিকেল জার্নালে Haroon's cornia grafting হিসেবে এর উল্লেখ আছে।

এই রাজপুত্রের ঢাকা শহরের ওয়ারীতে একটা দোতলা বাড়ি। আছে। বাড়ির নাম 'ছায়াকুটির'। ছায়া আমার শাশুড়ির ডাকনাম। আমার শ্বশুর সাহেব স্ত্রীকে যে নামে ডাকতেন বাড়ির কপালেও সেই জুটল। তাদের দু'টা গাড়ি আছে। একটা কালো রঙের মরিস মাইনর, একটা লাল রঙের ভক্সওয়াগন।

আমার শ্বশুর সাহেব ব্যাংকার ছিলেন। হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষ। বিয়ের পানচিনিতে তাঁকে আমি প্রথম দেখি। আমাকে পাশে বসিয়ে তিনি বললেন, আমার ছেলে আমাকে ডাকে বাবুই। তাকে শেখানো হয়েছিল বাবাই ডাক। সে ডাকা শুরু করল বাবুই। আমি তার কাছে হয়ে গেলাম—
'পক্ষী'। তুমিও আমাকে বাবুই ডাকবে। পুত্র এবং পুত্রবধূ দু'জনের কাজেই আমি পক্ষী হিসেবে থাকব। হা হা হা।

আমার শ্বশুর সাহেবকে আমার বাবুই ডাকা হয় নি। আমাদের বিয়ে হলো রাত আটটায়। উনি সেই রাতেই এগারোটার দিকে মারা গেলেন। বিয়ের আনন্দবাড়ি শোকে ডুবে গেল। আমার শাশুড়ি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন। আমি সাক্ষাৎ ডাইনি। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

বাসর রাত নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর গল্প শুনেছি। আমাদের বাসর ছিল বেহুলা-লক্ষিন্দর টাইপ বাসর। যেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে কিলবিল করছে ভয়ঙ্কর কাল সাপ।

আমার শাশুড়ি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কথাবার্তা খুব কম। বলতেন। শুধু নিজের ছেলের সঙ্গে গলা নিচু করে নানান কথা বলতেন। তিনি এক অর্থে ভাগ্যবতী ছিলেন। ছেলে পেয়েছেন মাতৃভক্ত। বিদ্যাসাগর মায়ের জন্যে সাঁতরে দামোদর নদী পার হয়েছিলেন। আমার শাশুড়ির ছেলে মায়ের জন্যে সাঁতরে যমুনা পার হতো। যদি সে সাঁতার জানত। হারুন সাঁতার জানে না।

হারুনের মাতৃভক্তির নমুনা না দিলে আপনি বুঝবেন না। আমি নমুনা দিচ্ছি। আমার শাশুড়ি তাঁর শোবার ঘরের দরজা কখনো বন্ধ করতেন না। সারারাত দরজা খোলা থাকত। কারণ তাঁর ছেলের ভয় পাওয়া রোগ আছে। ভয় পেলে সে যেন যে-কোনো সময় মা'র ঘরে যেতে পারে

সেই ব্যবস্থা। এমন অনেকবার হয়েছে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি, আমার বিছানার পাশে সে নেই। আমি আমার শাশুড়ির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছি, মাতা-পুত্র খাটের উপর বসে গল্প করছে। দু'জনই আনন্দিত। আমি সবসময় চেষ্টা করতাম ওরা যেন আমার উপস্থিতি টের না পায়। কিন্তু

প্রতিবারই আমার উপস্থিতি আমার শাশুড়ি টের পেতেন এবং বিরক্ত কিন্তু শান্ত গলায় বলতেন, বৌমা তুমি শুয়ে পড়, আমি ওকে পাঠাচ্ছি।

আমার এবং হারুনের আলাদা কোনো জীবন ছিল না। মনে করুন রেস্টুরেন্টে খেতে যাব, সেখানেও আমার শাশুড়ি। হারুন মা'কে ছাড়া কোথাও যাবে না। আমার শাশুড়ি আপত্তি করতেন। তিনি বলতেন, তোরা দু'জন খেতে যাচ্ছিস যা। আমি কেন? হারুন রেগে গিয়ে বলত তোমাকে ছাড়া আমি যদি রেস্টুরেন্ট খেতে যাই, তাহলে আমার নাম হারুন রশীদ না। আমার নাম কুত্তা রশীদ। এরপর আর কারোই বলার কিছু থাকে। না।

তবে একবার শুধু আমরা দু'জন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি হারুন ড্রাইভ করেছে। আমি বসেছি তার পাশে। কী আনন্দের ভ্রমণ যে সেটা ছিল! থামতে থামতে যাওয়া। দরিদ্র চায়ের দোকানে গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া। যাওয়ার পথে এক জায়গায় হাট পড়ল। আমরা গ্রাম্য হাটে ঘুরে বেড়ালাম। কাঁচামরিচ, পটলের দাম করলাম। হারুন বলল, ঐ দেখ গরু ছাগলের হাট। দূরদাম করে একটা ছাগল কিনে ফেলব। নাকি? আমি বললাম, কিনবেই যখন ছাগল কেন, এসো একটা গরু কিনে ফেলি। গাড়ির ছাদে করে নিয়ে যাই।

আনন্দ করতে করতে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছলাম রাত আটটার দিকে। পর্যটনের একটা মোটেল আছে, শৈবাল নাম। সেখানে আমাদের একটা ডিলাক্সরুম বুকিং দেয়া ছিল। শৈবালের লাউঞ্জে এসে আমি হতভম্ব হয়ে দেখি, আমার শাশুড়ি বিশাল এক সুটকেস নিয়ে লাউঞ্জে বসে
আছেন। প্রথম ভাবলাম চোখে ভুল দেখছি। আমি হারুনের দিকে তাকালাম। সে আনন্দিত গলায়
বলল, তুমি সারপ্রাইজ হয়েছ কি-না বলো? আমি শীতল গলায় বললাম, সারপ্রাইজ হয়েছি।

সে বলল, বেশি সারপ্রাইজ না মিডিয়াম সারপ্রাইজ?

আমি বললাম, বেশি সারপ্রাইজ।

হারুন বলল, তোমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে আমি এই কাজ করেছি। মা'কে প্লেনের

টিকিট কেটে দিয়ে এসেছিলাম। আমরা রওনা হবার পর মা প্লেনে উঠেছেন। আমাদের আগে
পৌছেছেন। ভালো করেছি না?

আমি বললাম, ভালো করেছ।

হারুন বলল, আমি সাঁতার জানি না তো। মা পাশে থাকলে ভয় নেই। মা আবার সাঁতারে এক্সপার্ট।

আমি শাশুড়ির কাছে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ দোয়া করলেন।

কক্সবাজার ট্রিপটা আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার ধারণা সেখানেই আমি কনসিভ করি। এইসব জিনিস মেয়েরা বুঝতে পারে। আমি আমার বাবুর নামও ঠিক করে ফেলি। ছেলে হোক বা মেয়েই হোক, আমার বাবুর নাম হবে সাগর।

কক্সবাজার থেকে ফেরার আটমাসের মাথায় সাগরের জন্ম হলো। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। বড় বড় চোখ। আমি তার চোখের দিকে তাকালেই সাগর দেখতে পাই। বাবুকে যখনই কোলে। নিতাম আমার কাছে মনে হতো, আমার যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি। এই পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাইবার নেই। এক সেকেন্ডের জন্যেও বাবুকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করত না। বাধ্য হয়ে আমি বাবুকে না দেখে থাকতাম, কারণ আমি তখন। কেমিস্ট্রির লেকচারারশিপের চাকরি পেয়েছি। সরকারি কলেজের চাকরি। ক্লাস বেশি না, কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই

যেতে হতো। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন খুবই কড়া।

চিল আকাশে উড়ে, তার দৃষ্টি থাকে স্থলে। আমি কলেজে ছাত্র পড়াই, আমার মন পড়ে থাকে বাবুর কাছে। আমার শাশুড়ি কি ঠিকমতো দেখাশোনা করছেন? কাজের মেয়েটা কি পানি সেদ্ধ করে ফর্মুলা বানাচ্ছে? না-কি ট্যাপের পানি দিয়ে। কাজ সারছে? সাগর কি ভেজা। কাঁথায় শুয়ে আছে? তার কথা কি সময়মতো বদলানো হচ্ছে? তাকে গোসল দেয়ার সময় কানে পানি ঢুকে নি তো? বিছানার ঠিক মাঝখানে তাকে শোয়ানো হচ্ছে তো? সিলিং ফ্যানের নিচে শোয়ানো হচ্ছে না তো? কতরকম দুর্ঘটনা হয়। দেখা গেল, ফ্যান সিলিং থেকে খুলে নিচে পড়ে গেছে।

একটা শিশুকে একা বড় করা যায় না। সবার সাহায্য লাগে। হারুনের কোনো সাহায্য আমি পেলাম না। সব বাবাই প্রথম সন্তান নিয়ে অনেক আহ্লাদ করে। বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে থাকা, ছবি তোলা... হারুন তার কিছুই করল না। একসময় সে আলাদা বিছানা করে ঘুমুতে শুরু করল। রাতে বাচ্চা জেগে থাকে, কান্নাকাটি করে, তার না-কি ঘুমের সমস্যা হয়।

একদিন অবাক হয়ে দেখি হারুনের গলায় দু'টা বিজ। আমি বললাম, তাবিজ কিসের?

সে জবাব দেয় না। আমতা আমতা করে। খুব চেপে ধরায় বলল, মা দিয়েছেন। সামনে আমার মহাবিপদ, এই জন্যেই তাবিজ।

আমি বললাম, উনি কী করে বুঝলেন, সামনে তোমার মহাবিপদ?

হারুন বলল, মা স্বপ্নে। দেখেছেন। উনি স্বপ্নে যা দেখেন তাই হয়।

স্বপ্নে কী দেখেছেন?

হারুন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মা'র স্বপ্ন। তোমাকে বলব না।

কেন বলবে না? মা নিষেধ করেছেন।

আমি অতি দ্রুত দুই এ দুই এ চার মেলালাম। আমাকে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করা হয়েছে, এর অর্থ একটাই স্বপ্নে আমার ভূমিকা আছে। খুব সম্ভব হারুনের মহাবিপদের সঙ্গে আমি যুক্ত।

আমি বললাম, তোমার মহাবিপদে কি আমার কোনো ভূমিকা আছে? মহাবিপদটা কি আমি ঘটাচ্ছি?

হারুন মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, হু।

আমি বললাম, তোমাকে আমি খুন করছি এরকম কিছু?

হারুন আবার বলল, হুঁ।

খুনটা করছি কীভাবে? গলা টিপে?

হারুন বলল, ছুরি দিয়ে গলা কেটে।

এই জন্যেই কি তুমি আলাদা ঘুমাও?

হু।

তুমি বুদ্ধিমান আধুনিক একজন মানুষ। বিদেশে পড়াশোনা করেছ। স্বপ্নের মতো হাস্যকর জিনিস তুমি বিশ্বাস কর?
না।

তাহলে গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে ঘুরছ কেন? তাবিজ খোল।

না।

না কেন?

মা রাগ করবে।

মা-ই কি তোমার সব? আমি কিছু না? তোমার ছেলে কিছু না?

হারুন জবাব দিল না। আমি বললাম, তোমাকে একটা অনুরোধ করব। তোমাকে সেই অনুরোধ রাখতে হবে। বললা রাখবে। হারুন বলল, রাখব।

আমার হাত ধরে বলে রাখবে।

হারুন আমার হাত ধরে বলল, সে অনুরোধ রাখবে।

এবং আমার এই অনুরোধের কথা মা'কে জানতে পারবে না।

জানাব না।

আমার অনুরোধ হচ্ছে, তুমি একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া করবে। সেই ফ্ল্যাটে আমি, তুমি এবং বাবু থাকব। তোমার মা থাকবেন না।

হারুনের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দিনেদুপুরে ভূত দেখলে মানুষের যে অবস্থা হয়। সেই অবস্থা। সে বিড়বিড় করে বলল, এই স্বপ্নটাই মা দেখেছেন।

আমি বললাম, বিড়বিড় করবে না। পরিষ্কার করে বলো।

হারুন বলল, মা স্বপ্ন দেখেছেন মা'কে এ বাড়িতে রেখে আমরা তিনজন আলাদা। ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি। তারপর তুমি আমাকে খুন করেছ।

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমার মা স্বপ্নে যাই দেখুন, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে। তুমি যদি ফ্ল্যাট ভাড়া না নাও তাহলে আমি কিন্তু বাবুকে নিয়ে চাচার বাসায় চলে যাব। বাকিজীবন তুমি আমার বা তোমার ছেলের দেখা পাবে না। I mean it.

হারুন বলল, ফ্ল্যাট ভাড়া করব।

সত্যি? হ্যা সত্যি।

হারুন সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট ভাড়া করল। তিনতলায় চার কামরার সুন্দর ফ্ল্যাট। দক্ষিণে খোলা। বারান্দা আছে। ফ্ল্যাট দেখে আমি মুগ্ধ। হারুনদের পুরনো বাড়ির উঁচু সিলিং আমার খুব অপছন্দ
ছিল। সেই বাড়ির চারদিকে বড় বড় গাছপালা। গাছের জন্যে বাড়িতে আলো ঢুকতে পারত না
এমন অবস্থা।

এপ্রিল মাস থেকে বাড়ি ভাড়া নেয়া হলো। আমরা ঠিক করলাম এপ্রিল মাসের এক তারিখ April fool’s day. সেদিন নতুন ফ্ল্যাটে না গিয়ে দু’ তারিখে। উঠব। আমি ভেবেছিলাম আমার
শাশুড়ি ব্যাপারটা নিয়ে খুব হৈচৈ করবেন, বেঁকে দাঁড়াবেন। সেরকম কিছুই করলেন না। বরং শান্তগলায় বললেন, ঠিক আছে। যাও। সপ্তাহে একদিন বাবুকে এনে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, অবশ্যই।

শাশুড়ি বললেন, তোমার চাচার বাড়ি থেকে কাউকে স্থায়ীভাবে এনে তোমাদের ফ্ল্যাটে রাখতে পার কি-না দেখ। তুমি কলেজে চলে যাবে, কাজের মেয়েদের হাতে এত ছোট বাচ্চা রেখে
যাওয়া ঠিক না।

আমি বললাম, সেই ব্যবস্থা করব।

মহা আনন্দে আমি গোছগাছ শুরু করলাম। নতুন সংসার শুরু করতে যাচ্ছি সেই আনন্দেও আমি আত্মহারা। মা'র কঠিন বলয় থেকে হারুনের মুক্তিও অনেক বড় ব্যাপার।

এপ্রিল মাসের দু'তারিখ বাড়ি ছাড়ব, এক তারিখে দুর্ঘটনা ঘটল। আমার বাবু মারা গেল। আমি তখন কলেজে। প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি। কলেজের প্রিন্সিপাল হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে বললেন, শায়লা আপনি এক্ষুনি বাড়ি যান। আপনার বাচ্চা অসুস্থ। আমার গাড়ি আছে, গাড়ি নিয়ে যান।

বাড়িতে পৌঁছে দেখি আমার শাশুড়ি মৃত বাচ্চা কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। তিনি ক্ষীণগলায় বললেন, বৌমা সব শেষ।

আমার বাচ্চাটি কীভাবে মারা গেল, তার কী হয়েছিল, আমি কিছুই জানতে পারি নি। আমার
শাশুড়ি আমাকে বলেন নি। যে কাজের মেয়েটি বাচ্চার। দেখাশোনা করত তাকেও পাওয়া যায় নি। দুর্ঘটনার দিন কাচের জগ ভাঙার মতো অতি গুরুতর অপরাধে (?) তার চাকরি চলে যায়। আমার শাশুড়ি তাকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দেন। বাসায় একজন কেয়ারটেকার থাকত, সবুর মিয়া। সবুর মিয়াও ঘটনার সময় বাসায় ছিল না। শাশুড়ি তাকে কী এক কাজে নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়েছিলেন। আমি শাশুড়ির কাছ থেকে ঘটনা জানতে চেয়েছি, তিনি কিছুই বলেন নি। শুধু
বলেছেন, আমি কিছু বলব না, তোমরা ফ্ল্যাট বাড়িতে চলে যাও। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

আমি বাচ্চাটার সুরতহাল করাতে পারতাম, তার জন্যে পুলিশ কেইস করতে হতো। সেটা করা সম্ভব ছিল না। আমার নিজের মাথাও তখন পুরোপুরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করলেই দেখতাম আমার ছোট্ট বাবু হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে আসছে। তার সব ঠিক আছে হাসি হাসি মুখ, বড় বড় মায়াভর্তি চোখ; শুধু মুখ দিয়ে টপটপ করে। রক্তের ফোঁটা পড়ছে। দীর্ঘদিন গুলশানের এক মনোরোগ ক্লিনিকে আমাকে কাটাতে হয়েছে। সেখানেই আমি একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুইসাইডের চেষ্টা করি।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমার শাশুড়ি মারা গেছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু। ডায়রিয়া হয়ে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু মৃত্যুর পরও তিনি আমার স্বামীকে ছাড়েন নি। এখনো হারুনের ঘাড়ে ভর করে আছেন। তিনি হারুনকে কন্ট্রোল করে যাচ্ছেন। হারুন তার জীবিত মায়ের দ্বারা যেভাবে চালিত হতো, মৃত মাও তাকে সেভাবেই চালিত করছে।

আমাদের আর কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি। কারণ আমার শাশুড়ি তাঁর অতি আদরের ছেলেকে বলেছেন যেন আমার সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক না হয়।

আমি আপনাকে লেখা। আমার এই দীর্ঘ চিঠি এখানে শেষ করছি। আপনাকে 'বাবা' সম্বোধন করেছি যেন আপনি চিঠির এক কন্যার প্রতি দয়া করেন এবং চিঠি-কন্যার পুত্রের মৃত্যুরহস্য বের করেন। আমার ধারণা এই রহস্য ভেদ হওয়া মাত্র হারুনের মোহমুক্তি ঘটবে। সে তার মৃত মা'কে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবে। আমি হারুনকে নিয়ে। সত্যিকার সংসার শুরু করতে পারব।

বিনীতা

চিঠিকন্যা শায়লা

৩. মানুষের গল্প বলার Style

(লেখকের কথা)

একেকজন মানুষের গল্প বলার Style একেক রকম। অতি সাধারণ কথা মিসির আলি যখন বলেন তখন মনে হয় দারুণ রহস্যময় কোনোকিছুর বর্ণনা দিচ্ছেন। উদাহরণ দেই—একদিন তাঁর বাসায় গেছি। তিনি জানালার পাশে বসে গল্প করছেন। গল্পের এক পর্যায়ে বললেন 'বুঝলেন ভাই! তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এত্ত বড় একটা চাঁদ। শুনে আমার গা ছমছম করে উঠল। আমি চমকে মিসির আলির জানালা দিয়ে তাকলাম। অথচ চমকাবার কিছু নেই। পূর্ণিমার রাতে জানালা দিয়ে এত্ত বড় চাঁদ দেখা যেতেই পারে।

এই তিনিই আবার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এমন সাদামাটাভাবে বলেন যেন এটা কিছুই না। এরকম রোজই ঘটছে। এক সিরিয়েল কিলার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন 'লোকটার অভ্যাস ছিল খেজুরের কাঁটা দিয়ে ভিকটিমের চোখ গেলে দেয়া। তাঁর বলার ভঙ্গি, বলতে বলতে হাই তোলা থেকে শ্রোতাদের ধারণা হবে খেজুরের কাঁটা দিয়ে চোখ তোলা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কিছু না।

আমি অনেকদিন থেকেই মিসির আলিকে বলছিলাম, তাঁর রহস্য সমাধানের প্রক্রিয়ায় খুব কাছ থেকে আমি যুক্ত হতে চাই। আমি দেখতে চাই তিনি কাজটা কীভাবে করেন। লজিকের সিঁড়ি কীভাবে পাতেন। রহস্যের প্রতি আমার আগ্রহ না। আমার আগ্রহ রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার প্রতি। সুযোগ সে অর্থে আসে নি। আমি নিজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি, মিসির আলি

ঘরকুনো মানুষ। তিনি নিজেও তাঁর মানসিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দু'জনের দেখা হয় না বললেই হয়।

এই সময় আমি আমার পারিবারিক ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে বসলাম। সমাজের একজন দুষ্ট মানুষ হিসেবে আমার পরিচয় ঘটল এবং মিটিং করে নিজের বাড়ি থেকে বের করে। দেয়া হলো। পত্র-পত্রিকাগুলিতে ছাপার মতো খবর অনেক দিন ছিল না। তারা মনের আনন্দে আমাকে নিয়ে নানান গল্প ফাঁদতে লাগল। মিসির আলি সাহেবের যে গল্পটি এখানে লিখছি, সেখানে আমার ব্যক্তিগত গল্পের স্থান নেই বলেই নিজের গল্প বাদ থাকল। অন্য কোনোদিন সেই গল্প বলা হবে।

যাই হোক, আমি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কিছুদিন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করলাম। বন্ধু-বান্ধবরা তেমন আগ্রহ দেখাল না। 'মহাবিপদ' কে সেধে পুষতে চায়? বাধ্য হয়ে উত্তরায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। তিনতলায় একা থাকি। দিনেরবেলা অফিসের একজন পিয়ন থাকে। হোটেল থেকে খাবার এনে দিয়ে সন্ধ্যায় নিজের বাসায় চলে যায়। আমি তাকে চক্ষুলজ্জায় বলতে পারি না যে তুমি। থাকো। এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকতে ভয় পাই।

ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে, আমি মোটামুটি নিশ্চিত ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি না। আমার সঙ্গে বিদেহী কোনো আত্মাও থাকেন। তিনি গভীর রাতে কাঠের মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করেন। শব্দ করে নিঃশ্বাস নেন। রান্নাঘরে পানির টেপ ছেড়ে হাতেমুখে পানি দেন। এক রাতের ঘটনা তো ভয়ঙ্কর। রাত তিনটা বাজে। বাথরুমে যাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নেমেছি, হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে বেঁটে মতো এক ছায়া মূর্তি। সে আমার চোখের সামনে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে গেল। আমি বিকট চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। চিঙ্কার

দিয়ে তো লাভ নেই। যে বিদেহী আত্মা আমার সঙ্গে বাস করেন, তিনি ছাড়া আমার চিৎকার কেউ শুনবে না।

এরপর থেকে ঐ বাড়িতে রাত কাটানো আমার জন্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যার পর প্রতিটি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখি। কারেন্ট চলে যেতে পারে এই ভয়ে সব ঘরেই চার্জার। আমার বালিশের নিচে থাকে। টর্চলাইট। হাতের কাছে টেবিলে দেয়াশলাই এবং মোমবাতি। লোহা সঙ্গে রাখলে ভূত আসে। না। আমার শোবার ঘরে এই কারণেই রট আয়রনের খাট কিনে সেট করা হলো। তারপরেও ভয় কাটে না। রাতগুলি বলতে গেলে জেগেই কাটাই।

আমার এই বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় মিসির আলি হঠাৎ খুঁজে খুঁজে বাসায় উপস্থিত হলেন। তিনি এসেছেন পত্রপত্রিকা পড়ে। মিসির আলি আবেগপ্রবণ মানুষ কখনো ছিলেন। না। তাঁর আবেগ এবং উচ্ছাস খুবই নিয়ন্ত্রিত। তারপরেও তিনি যথেষ্ট আবেগ দেখালেন। আমাকে বললেন, আপনার মতো গৃহী মানুষকে ঘরছাড়া দেখে খারাপ লাগছে। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?

আমি বললাম, আপাতত আপনি আমাকে ভূতের হাত থেকে বাঁচান। একটা ভূত আমাকে রাতে ঘুমাতে দিচ্ছে না। কাঠের ফ্লোরে সে রাতে হাঁটাহাঁটি করে। আমি নিজে ভূতটাকে দেখেছি।

মিসির আলি বললেন, কাঠ দিনের গরমে। প্রসারিত হয়। রাতের ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। তখনই নানান শব্দ হয়।

আমি বললাম, কাঠের এই ব্যাপারটা মানলাম। কিন্তু রান্নাঘরে ভূতটা পানির কল ছাড়ে। ছড়ছড় করে পানি পড়ার শব্দ আমি রোজ রাতেই দুই তিনবার শুনি।

মিসির আলি শান্তগলায় বললেন, রাতে চারদিক থাকে নীরব। আপনার নিচের তলা বা উপরের তলার লোকজন যখন কল ছাড়ে তখন সেই শব্দ ভেসে আসে। এর বেশি কিছু না। আপনি ভূতের ভয়ে মানসিকভাবে উত্তেজিত থাকেন বলেই হালকা পানি পড়ার শব্দ বড় হয়ে কানে বাজে।

আমি বললাম, সরাসরি যে ভূত দেখেছি সেটা কী? বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেলাম, হাঁটু সাইজের একটা ভূত দেয়ালের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত গেল এবং মিলিয়ে গেল।

মিসির আলি বললেন, আপনি নিজের ছায়া দেয়ালে দেখেছেন। ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিন। ঐ রাতের মতো বিছানা থেকে নামুন। বাথরুমে যান। নিজের ছায়া দেখবেন।

আমি তাই করলাম। নিজের কোনো ছায়া দেখলাম না।

মিসির আলি মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, ঐ রাতে নিশ্চয়ই আপনার TV খোলা ছিল। TV স্ক্রিন থেকে আসা আলোয় আপনার ছায়া পড়েছে। টিভি ছাড়ুন।

আমি টিভি ছাড়তেই দেয়ালে নিজের ছায়া দেখলাম।

মিসির আলি বললেন, হেঁটে বাথরুম পর্যন্ত যান। ছায়াকে হেঁটে যেতে দেখবেন।

আমি বললাম, এখন আর তার প্রয়োজন। দেখছি না।

মিসির আলি বললেন, ভয় কেটেছে? আমি হা-সূচক মাথা নাড়লাম।

মিসির আলি বললেন, এখন কি রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারবেন?

আমি বললাম, না।

মিসির আলি বললেন, বাতি জ্বালিয়েই ঘুমুবেন। সমস্যা কিছু নেই। ঘুমুবার জন্যে

অন্ধকার কোনো পূর্বশর্ত না। ভালো কথা, এ। বাড়িতে গেস্টম আছে না?

আমি বললাম, আছে।

মিসির আলি বললেন, আগামী কয়েকদিন যদি আমি আপনার গেস্টরুমে বাস করি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে?

কবে থেকে থাকা শুরু করবেন?

আজ থেকেই। আমি প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় সঙ্গে করে এনেছি। শুধু টুথপেস্ট আনা হয় নি। টুথব্রাশ এনেছি।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি এখন চোখে পড়ল, মিসির আলি ছোট্ট একটা চামড়ার সুটকেস এবং হাত ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। কাজটা তিনি করেছেন শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। আনন্দে আমার চোখে পানি আসার জোগাড় হলো।

মিসির আলি বললেন, আপনি অনেকদিন থেকে বলছিলেন আমার কোনো একটা রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান। এই মুহূর্তে আমি একটা রহস্য নিয়ে ভাবছি। আপনি চাইলে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন।

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম, অবশ্যই যুক্ত থাকতে চাই।

দশ পৃষ্ঠার একটা চিঠি এখন আপনাকে দিচ্ছি। রসায়নের একজন অধ্যাপিকা চিঠিটা দিয়েছেন। আপনি মন দিয়ে চিঠিটা তিনবার পড়বেন। ইতোমধ্যে আমি আপনার গেস্টরুমে স্থায়ী হচ্ছি। ভালো কথা, আপনার এখানে কি চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে?

ব্যবস্থা নেই।

রাতে ঘুম না এলে আমাকে চা খেতে হয়। টি ব্যাগ, চা-চিনির ব্যবস্থা করছি। রান্নার চুলা ঠিক আছে তো?

জানি না। মিসির আলি বললেন, আপনি চিঠি পড়ুন, আমি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি।

আমি চিঠি নিয়ে বসলাম। যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েই পড়তে শুরু করলাম। এক-দুই পৃষ্ঠা পড়ার পরই স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, রসায়নের এই অধ্যাপিকার বাংলা গদ্যের উপর ভালো দখল আছে। হাতের লেখাও গোটা গোটা। নির্ভুল বানান।

চিঠির মূল বক্তব্য সন্তানের মৃত্যু রহস্যের সমাধান। আমার কাছে সমাধান খুব কঠিন বলে মনে হলো না। সন্তানের মা সমাধান নিজেই করেছেন। সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিতও চিঠিতে দেয়া। ভদ্রমহিলা তাঁর শাশুড়িকে দায়ী করেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। এই বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ড

নির্বিঘ্নে করার জন্যে বাড়ির সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুনি বৃদ্ধার মোটিভও পরিষ্কার। এই বৃদ্ধা তার ছেলেকে কাছে রাখতে চান। তিনি চান না ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকুক। ছেলেকে পাশে রাখার জন্যে যে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা কাজ করেছে। ছেলে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে নি।

যে রহস্যের কথা চিঠিতে বলা হয়েছে সেই রহস্য সাদামাটা রহস্য। রহস্যভেদের জন্যে মিসির আলির মতো মানুষ লাগে না। আমার মতো গড়পড়তা মেধার যে-কোনো মানুষই এই রহস্যভেদ করবে।

অনেকদিন পর হোটেলের রান্নার বাইরে খাবার খেলাম। বাবুর্চি মিসির আলি সাহেব। চিকন চালের ভাত। আলু ভর্তা। ডিম ভাজি এবং ডাল। খেতে বসে মনে হলো, অনেকদিন এত ভালো খাওয়া হয় নি।

মিসির আলি বললেন, বাঙালি রান্না দুই রকম। ব্যাপক আয়োজনের রান্না এবং আয়োজনহীন রান্না। আপনাকে কিছু রান্না আমি শিখিয়ে দেব। নিজে রাঁধবেন। নিজের রান্না খাবেন। আলু ভর্তার জন্যে আলু আলাদা সিদ্ধ করতে হবে না। ভাতের সঙ্গে দিয়ে দেবেন। ডাল রান্নার মূল মন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধ। যত সিদ্ধ হবে ডাল তত খেতে ভালো হবে। তবে তেলে বাগার দিতে হবে। সিদ্ধ হতে হতে ডাল যখন 'কিলয়েড' ফর্মে চলে যাবে তখন বাগার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। বাগারের কারণে তেল ডালের কণার উপর আস্তরণ তৈরি করবে। বাগারের তেলে বাঙালি মেয়েরা পেঁয়াজ-রসুন ভেজে নেয়। আমি তার

প্রয়োজন দেখি না। পেঁয়াজরসুন ছাড়া ডাল রাধে বিধবারা। সেই ডাল খেতে সুস্বাদু। ইলিশ মাছ খুব অল্প আঁচে সিদ্ধ। হয়, এটা কি জানেন?

জানি না।

মসলা মাখিয়ে ইলিশ মাছের টুকরো রোদে রেখে দিলেও সিদ্ধ হয়ে যায়। আপনাকে রোদে রাখতে হবে না। গরম ভাতের উপর রেখে ঢাকনা দিয়ে রাখলেই হবে।

মসলা কী?

মসলা হচ্ছে লবণ। আর কিছু না। বাঙালি মেয়েরা ভাপা ইলিশে নানান মসলা দেয়। মসলা মাছের স্বাদ নষ্ট করে। কোনো রকম মসলা ছাড়া ভাপা ইলিশ একবার খেলেই আপনার আর মসলা খেতে ইচ্ছা করবে না।

আমি ঘোষণা করলাম, আগামীকাল রাতের সব রান্না আমি করব। মেন ইলিশ মাছ, ডাল, আলু ভর্তা। ভালো ঘিও কিনে আনব। গরম ভাতের উপর এক চামচ ঘি ছেড়ে দেয়া হবে। ভাতের গন্ধের সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধ মিশে অমৃতসম কিছু তৈরি হবার কথা। ভেবেই আনন্দ পাচ্ছি এবং এক ধরনের উত্তেজনাও বোধ করছি। দুপুরে বাজার করতে হবে। একটা ফ্রিজ কেনা দরকার।

মিসির আলি হঠাৎ বললেন, ব্যাচেলর জীবনে কিছু আনন্দ আছে, তাই না?

আমি ধাক্কার মতো খেলাম। আমার মনে হলো, রান্নাবান্নার এই বিষয়টি মিসির আলি ইচ্ছা করে আমার ভেতর ঢুকিয়েছেন যেন আমি ব্যস্ত থাকতে পারি।

রাতের খাওয়া শেষে দু'জন বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি। দক্ষিণমুখী বারান্দা। ভালো হাওয়া দিচ্ছে। দু'জনের হাতেই সিগারেট। মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান। দিয়ে বললেন, আজকাল সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে 'ধূমপান মৃত্যু ঘটায়'। পড়েছেন?

আমি বললাম, পড়েছি। মিসির আলি বললেন, আমার নিজের ধারণা সিগারেটের প্যাকেটে এই সতর্কবাণী দেয়ার পর থেকে সিগারেটের বিক্রি অনেক বেড়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

মিসির আলি হাই তুলতে তুলতে বললেন, মানুষের মৃত্যু বিষয়ে আছে প্রচণ্ড ভীতি। সে মৃত্যু কী জানতে আগ্রহী। এই আগ্রহের কারণে অবচেতনভাবে মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি যেতে চায়। সিগারেট সেই কাছাকাছি থাকার সহজ উপায়।

আমি বললাম, যুক্তি খারাপ না।

মিসির আলি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, যারা ছাদে বেড়াতে চায় তাদেরকে দেখবেন এক সময় ছাদের রেলিং-এ বসেছে। অতি বিপদজনক জেনেও এই কাজটা করছে। মূল কারণ একটাই, মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়া। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী। ভালো কথা, আপনি কি আমার কন্যার চিঠিটা পড়েছেন?

তিনবার পড়তে বলেছিলেন, আমি দু'বার পড়েছি।

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে বললেন, চিঠি পড়ে কি কোনো খটকা লেগেছে?

আমি বললাম, হুট করে আপনাকে বাবা ডাকাটায় সামান্য খটকা লেগেছে। 'বাবা' ডাক ছাড়া চিঠিতে খটকা নেই। চিঠির রহস্য আপনার মতো মানুষের পক্ষে মুহূর্তেই বের করার কথা।

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, রহস্য বের করেছি। একটা কাগজে লিখে খামে বন্ধ করে রেখেছি। খামটা আপনি রাখবেন, তবে খুলে এখনো পড়বেন না।

কখন পড়ব?

আপনি নিজে যখন রহস্যভেদ করবেন। তখন পড়বেন।

আমি রহস্যভেদ করব?

হা আপনি করবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি একা বাস করছেন, রহস্য নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত থাকবেন। মানব মনের গতি প্রকৃতি জানবেন। আপনি লেখক মানুষ, এতে আপনার লাভই হবে।

আমি বললাম, সাগর নামের বাচ্চাটা তার দাদির হাতে খুন হয়েছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, চট করে সিদ্ধান্তে যাবেন না। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ না হলে কেউ এই কাজ করতে পারে না। চিঠি পড়ে কি মনে হয়, ছেলেটির দাদি মানসিকভাবে অসুস্থ?

তা মনে হয় না। তাহলে কি ছেলেটির বাবা মানসিক রোগী? চিঠিতে সে রকম আছে। হারুন নামের ডাক্তার তার মা'কে দেখে এইসব।

মিসির আলি বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয়? ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁকে চোখ দেখাতে যান। আপনি লেখক মানুষ। উনি আপনাকে চিনতে পারবেন। আমার ধারণা, উনি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। রাত অনেক। হয়েছে, চলুন ঘুমুতে যাওয়া যাক।

খামটা দিন।

মিসির আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে খাম বের করে দিলেন। তিনি খাম পকেটে নিয়েই গল্প করতে এসেছিলেন।

ডা. হারুনের কাছে মিসির আলি আমাকে নিয়ে গেলেন। এমনিতেই তাঁর চোখ দেখাবার কথা। সঙ্গে আমিও দেখাব।
ভদ্রলোকের আচারআচরণ লক্ষ করব। তেমন সুযোগ হলে কিছু প্রশ্নও করব। তবে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন মানুষকে দেখলেই চেনা যাবে। তাদের চোখে থাকবে ভরসা হারানো দৃষ্টি।

আমি ডাক্তার সাহেবকে দেখে হতাশই হলাম। সম্পূর্ণ সহজ-স্বাভাবিক একজন মানুষ। হাসিখুশি। তার টেবিলে বরফ মেশানো হলুদ রঙের পানীয়। রঙ দেখে মনে হচ্ছে হুইস্কি। যদি হুইস্কি হয় তাহলে ব্যাপারটা অবশ্যই অস্বাভাবিক।

কোনো ডাক্তারই হুইস্কি খেতে খেতে রোগী দেখতে পারেন না। আমি গ্লাসের। দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, কী খাচ্ছেন?

ডা. হারুন আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, হুইস্কি খাচ্ছি। আপনি খাবেন?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম।

খেয়ে দেখতে পারেন। খারাপ লাগবে না। দিনের শেষে ক্লান্তি নিবারক।

আমি বললাম, আপনি ক্লান্তি নিবারণ করুন। আমি তেমন ক্লান্তি বোধ করছি না।

ডাক্তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার চোখ দেখতে বসলেন। যত্ন করেই চোখ দেখলেন। বিল দিতে গেলাম। তিনি বললেন, মিসির আলি সাহেব আমার বন্ধু মানুষ। আপনাকে বিল দিতে হবে না।

আমি বললাম, আপনি কি বন্ধুর বন্ধুদের কাছ থেকে বিল নেন না?

না।

তাহলে তো একসময় দেখা যাবে, কারো। কাছ থেকেই আপনি বিল নিতে পারছেন না। সবাই ফ্রি।

আমি এমন কোনো হাসির কথা বলি নি। কিন্তু ভদ্রলোক মনে হলো খুব মজা পেলেন। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে অনেকক্ষণ হাসলেন। অ্যালকোহলের অ্যাফেক্টও হতে পারে।

তিনি ফ্লাস্ক থেকে ঐ বস্তু আরো খানিকটা ঢালতে ঢালতে বললেন, আমি টিটাটোলার মদ সিগারেট কিছুই খাই না। গ্লাসে যে বস্তু দেখছেন তা হলো তেঁতুলের পানি। তেঁতুলের পানি Arteriosclerosis কমায়। আমি যা করছি তা হলো দেশীয় ভেষজের মাধ্যমে চিকিৎসা।

আমি বললাম, আপনি তেঁতুলের পানি খাচ্ছেন, আমাকে কেন বললেন হুইস্কি খাচ্ছি!

হারুন সাহেব বললেন, আপনি ভ্রূ কুঁচকে গ্লাসটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এই জন্যেই বলেছি। আপনার আগেও কয়েকজন রোগী আপনার মতোই ভ্র কুঁচকে গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বলেছে, কী খাচ্ছেন? আমি তাদেরকেও বলেছি, হুইস্কি খাচ্ছি।

তাদের ভুল ভাঙান নি?

না। শুধু আপনারটাই ভাঙিয়েছি।

আমার ভুল ভাঙালেন কেন?

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, আপনি বন্ধু মানুষ। বেহেশতে আমরা কিন্তু আত্মীয়স্বজন পুত্রকন্যা পাব না। বন্ধু পাব। আমাদেরকে দেয়া হবে সতুরজন হুর। এরা। সবাই বন্ধু। পবিত্র সঙ্গী। কেউ আত্মীয় না।

আপনি কি বেহেশত দোজখ এইসব বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি। নামাজ পড়েন?

সময়মতো পড়া হয় না, তবে রাতে ঘুমুবার আগে কাজা পড়ি।

বেহেশতে যাবার জন্যে পড়েন?

ডাক্তার বেশকিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, বেহেশত দেখার প্রতি আমার আগ্রহ আছে। সেখানে যেসব পবিত্র সঙ্গিনী আছে, তাদের একজনকে আমি দেখেছি।

স্বপ্নে দেখেছেন?

স্বপ্নে না, ঘোরের মধ্যে দেখেছি। সেই গল্প অন্য একদিন বলব।

আমরা চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ ডাক্তার মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার মা আমাকে জানিয়েছেন, আপনি এখন নিজের বাসায় থাকেন না। অন্য এক জায়গায় থাকেন। আপনি যে ঘরে থাকেন, সেখানে দেয়াল ঘড়ি আছে। ঘড়িটা বন্ধ। ঘড়িতে সবসময় তিনটা বেজে থাকে। আমার মা কি ঠিক বলছেন?

মিসির আলি চিন্তিত গলায় বললেন, হ্যাঁ।

এখন কি বিশ্বাস করছেন, আমার মা'র সঙ্গে আমার কথা হয়? দেখা হয়?

মিসির আলি বললেন, না। কখন বিশ্বাস হবে? যখন তাঁকে নিজে দেখব।

ডাক্তারের ঠোঁটের কোনায় হালকা হাসির। | আভাস দেখা গেল। যেন তিনি মজার কোনো কথা বলবেন বলে ভাবছেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

মিসির আলি বললেন, আজ উঠি?

ডাক্তার বললেন, আরো কিছুক্ষণ বসুন, গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দেব। একটা প্রশ্নের জবাব

দিন, আপনি কি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বললেন, করি।

ডাক্তার বললেন, এদের তো আপনি চোখে দেখেন নি, তাহলে কেন বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বললেন, আমি চোখে না দেখলেও নানান যন্ত্রপাতি এদের অস্তিত্ব বের করেছে। একটি যন্ত্রের নাম সাইক্লন্ট্রন। পৃথিবীর কোনো যন্ত্রপাতি মৃত মানুষের অস্তিত্ব বের করতে পারে না।

ডাক্তার বললেন, সে রকম যন্ত্রপাতি তৈরি হয় নি বলেই পারে না। আমার পড়াশোনা যদি পদার্থবিদ্যায় হতো আমি নিজেই এরকম একটা যন্ত্র বানানোর চেষ্টা করতাম। যন্ত্রটার নাম দিতাম Soul searcher. যে যন্ত্র আত্মা অনুসন্ধান করে বেড়াবে। মনে করা যাক এই ঘরে একটা আত্মা আছে, যন্ত্রের কাজ হবে ঘরের প্রতিটি স্কয়ার ইঞ্চের রেডিও অ্যাকটিভিটি মাপবে, তাপ মাপবে, ইলেট্রিক্যাল চার্জ মাপবে, ম্যাগনেটিক বলরেখার ম্যাপ তৈরি করবে। সমস্ত ডাটা কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে। সফটওয়্যারের কাজ হবে anamoly detect করা।

ডাক্তার সাহেব প্রবল উৎসাহে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। যেন তিনি ক্লাস নিচ্ছেন, আমরা দুই মনোযোগী শ্রোতা। তাঁর ঘরে বোর্ড না থাকায় সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যন্ত্রের খুঁটিনাটি বোর্ডে একে দেখাতে পারছেন না। কাগজ-কলমে একে দেখাতে হচ্ছে।

আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় ছাড়া পেলাম। ডাক্তার সাহেব নিজেই পৌঁছে। দিলেন। তবে গাড়িতেও তিনি বকবক করতেই থাকলেন, এক মুহূর্তের জন্যেও থামলেন না।

প্রথম যেটা তৈরি করতে হবে তা হলো ম্যাগনেটিক টানেল, কিংবা Magnetic Cone তৈরি করা। আত্মাকে যদি কোনোক্রমে ভুলিয়ে ভালিয়ে টানেলে ঢুকিয়ে ফেলা যায় তাহলেই কর্ম কাবার।

আমি বোকা বোকা মুখ করে বললাম, কর্ম কাবার মানে কী? আত্মা মারা যাবে? মানুষ মরে আত্মা হয়, আত্মা মরে কী হবে?

ভেবেছিলাম আমার রসিকতায় তিনি রাগ করবেন। ভাগ্য ভালো, রাগ করলেন না। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করলেন আত্মা কী?

‘আত্মা হলো পিওর ফরম অব এনার্জি। আমরা যেসব এনার্জির সঙ্গে পরিচিত তার বাইরের এনার্জি। আমাদের এনার্জির ট্রান্সফরমেশন হয়। এক ফরম থেকে অন্য ফরমে যেতে পারে। আত্মা নামক এনার্জির কোনো ট্রান্সফরমেশন নেই। বুঝতে পারছেন তো?’

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তারপরেও প্রবল বেগে হা-সূচক মাথা নাড়লাম।

রাতে মিসির আলি সাহেবকে নিয়ে খেতে বসেছি। আয়োজন সামান্য। দুপুরের ডাল গরম করা হয়েছে। ডিম ভাজা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ডাল টকে গেছে। মিসির আলি সাহেব ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। টক ডাল খেয়ে যাচ্ছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি আছেন। গভীর চিন্তায়। আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব, আপনি কি আত্মা বিশ্বাস করেন?

তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, হা।

খুব যে ভেবেচিন্তে তিনি হা বললেন তা কিন্তু মনে হলো না। বলতে হয় বলে বলা। আত্মা-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে যাচ্ছি তার আগেই মিসির আলি বললেন, ডাক্তার সাহেব গাড়ি করে আপনার বাসায় আমাদের পৌছে। দিয়েছেন, ব্যাপারটা আপনার কেমন লেগেছে?

আমি বললাম, ভালো লেগেছে। ভদ্রলোক নিতান্তই ভালো মানুষ। ভালো মানুষরা পাগলাটে হয়, উনিও পাগলাটে।

মিসির আলি বললেন, উনার গাড়ির ড্রাইভার কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানা জানতে চায় নি। সে ঠিকানা জানতো। আগে এসেছে। ঠিক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, তাই তো!

মিসির আলি বললেন, ডাক্তার সাহেব আপনাকে চেনেন না। আজই প্রথম চিনলেন। উনি আপনার বাড়ি চেনেন, কারণ উনি আমাকে অনুসরণ করছেন। আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছেন।

আপনার পেছনে লোক লাগিয়ে রাখবে কেন?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, ঘড়ির ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনি যে বলে দিলেন আপনার ঘরের ঘড়িটা বন্ধ। তিনটা বেজে আছে।

সির আলি বললেন, এটা তুচ্ছ বিষয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কিছু নেই।

আমি বললাম, তুচ্ছ বলছেন কেন? ঘড়িটা তো বাইরে থেকে দেখা যায় না। এই ঘড়ি দেখতে হলে ঘরে ঢুকতে হবে। হবে না?

মিসির আলি আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন। না। বরং মনে হলো কিছুটা বিরক্তই হলেন। আমাকে হতাশ গলায় বললেন, শরীরটা খারাপ লাগছে। ডালটা কি নষ্ট ছিল?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, আমার কাছে টকটক অবশ্যি লাগছিল। আমি ভাবলাম কাঁচা আম দিয়ে ডাল টক করা হয়েছে।

এই সিজনে কাঁচা আম পাবেন কোথায়? মিসির আলি বললেন, তাও তো কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভেদবমি শুরু হলো। চোখ-মুখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। সামান্য টক ডাল এই অবস্থা তৈরি করতে পারে তা আমার ধারণাতেও ছিল না।

বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবার মনে হয় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। টেলিফোন করা মাত্র অ্যাম্বুলেন্স চলে এলো। তাঁকে ক্লিনিকে ভর্তি করলাম। তাঁর জ্ঞান ফিরল ভোর রাতে। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে বাক্যটি বললেন তা হলো আগামী দুই বছর আমি ডাল বা ডালজাতীয় কিছু খাব না।

৪. পেতেছি সমুদ্রে শয্যা

দু'ধরনের মানুষের মধ্যে পাগলামি প্রকাশিত হয়। প্রতিভাবান মানুষ এবং কর্মশূন্য মানুষ। মিসির আলি প্রতিভাবান মানুষ। তাঁর মধ্যে পাগলামি প্রকাশিত হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং হাসপাতালের বিছানায় তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হলো। তিনি এত বিষয় থাকতে 'ভূত নিয়ে প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। অতি ব্যস্ত প্রবন্ধকার। যখনই তাঁর কাছে যাই তাঁকে। প্রবন্ধের কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত দেখি।

হাসপাতালে তাঁর কিছু ভক্ত জুটে গেল। এর মধ্যে একজন নার্স, নাম— মিতি। তার প্রধান এবং একমাত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল মিসির আলিকে ভূতের গল্প শোনানো। জানা গেল তার গ্রামের বাড়ি (নয়াবাড়ি শ্রীপুর) ভূতের হোস্টেল। এমন কোনো ভূত নাই, যে এই মেয়ের গ্রামের বাড়িতে থাকে না। কুয়াভূত নামে এক ভূতের নাম তার কাছেই শুনলাম। এই ভূত থাকে কুয়ায়। হঠাৎ হঠাৎ কুয়া থেকে উঠে কুয়ার পাড়ে বসে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায়। মানুষজনের শব্দ শুনলে ঝপাং করে কুয়ায় ঝাপ দিয়ে পড়ে।

তেঁতুল ভূত' বলে এক ধরনের ভূতের কথা শোনা গেল, তারা থাকে তেঁতুল গাছে। এপ্রিল-মে মাসে যখন তেঁতুলের হলুদ ফুল ফোটে তখন তারা তেঁতুল ফুল চুষে ফুলের মধু খায়। যেসব গাছে তেঁতুল ভূত থাকে সেসব গাছে এই কারণেই তেঁতুল হয় না। মিতিদের গ্রামের বাড়িতে তিনটি তেঁতুল গাছের কোনোটিতেই তেঁতুল হয় না। বিশাল গাছ, প্রচুর ফুল ফুটে, কিন্তু তেঁতুল হয় না।

মিসির আলি এইসব উদ্ভট গল্প যে শুনছেন তা-না, রীতিমতো নোট করছেন। নানা মন্তব্যে খাতা ভর্তি করছেন। কুয়াভূত বিষয়ে তার মন্তব্যের পাতাগুলি পড়লাম

কুয়াভূত
পানিতে বাস করে এমন প্রজাতি
নারীধর্মী

কারণ কুয়াভূতকে সবসময় কুয়ার পাড়ে চুল আঁচড়াতে দেখা যায়। তবে এমনও হতে পারে পানিজীবী এই ভূতশ্রেণীর সবারই লম্বা চুল। সবাই চুল আঁচড়াতে পছন্দ করে।

প্রকৃতি: ভীতু প্রকৃতির। মানুষের আগমনের ইশারা পেলেই এরা কুয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কর্মকাণ্ড : এদের প্রধান কর্মকাণ্ড কুয়ার পানিতে ছোটাছুটি করা এবং পানি ছিটাছিটির খেলা করা।

চরিত্র : উপকারী চরিত্রের ভূত। মিতির এক খালার ছোট ছেলে একবার পানিতে পড়ে গিয়েছিল। কুয়াভূতরা বাচ্চাটিকে ঘাড়ে ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। বালতি নামিয়ে দিলে কুয়াভূতরা বাচ্চাটাকে বালতিতে তুলে দেয়।

গন্ধ : কুয়াভূতদের গায়ে পুরনো শ্যাওলার গন্ধ। কেউ কেউ বলে মাছের গন্ধ।

খাদ্য : এদের খাদ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ওদেরকে কুয়ার পাড়ে বসে পান। সুপারির মতো কী যেন চিবাতে দেখা গেছে।

পোশাক : এদের প্রিয় এবং একমাত্র পোশাক সাদা রঙের। সাদা রঙের কাপড় ছাড়া এদেরকে কেউ অন্য কোনো রঙের কাপড়ে দেখে নি।

কথাবার্তা : এদের কথাবার্তা কেউ কখনো শোনে নি, তবে হাসির শব্দ অনেকেই শুনেছে।

আমি কিছুতেই ভেবে পাই না মিসির আলির মতো অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষ কুয়াভূত বিষয়ে এতগুলি কথা এত

গুরুত্বের সঙ্গে কেন লিখছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কি কুয়াভূতের ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন?

মিসির আলি বললেন, আমি বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। মিতি মেয়েটা বানিয়ে বানিয়ে ভূত বিষয়ে এত কথা কেন বলবে?

আমি বললাম, মানুষ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে না? মানুষ প্রয়োজনে মিথ্যা বলে, অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলে, বানিয়ে বলে, অন্যকে বিপদে ফেলার জন্যে বলে।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি ধারণা মিতি মেয়েটা আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে কুয়াভূত নামক মিথ্যা বলছে?

আমি হাল ছেড়ে চুপ করে গেলাম। মিসির আলিকে যে রোগের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেই রোগ তার সেরে গেছে, তবে দেখা গেছে তিনি নানা ধরনের রোগে ভুগছেন। শরীরের বেশিরভাগ যন্ত্রপাতিই না-কি নষ্ট। দু'টা কিডনির একটা যায় যায়

অবস্থায় আছে। লিভারে জমেছে ফ্যাট। তাঁর চিকিৎসা ডাক্তাররা মহাউৎসাহে চালাচ্ছেন। মিতি নামের নার্স চালাচ্ছে 'ভূত-চিকিৎসা'।

মিসির আলি একদিন আগ্রহ নিয়ে বললেন, মেয়েটার গ্রামের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গেলে কেমন হয়?

আমি বললাম, আপনি মিতির গ্রামের বাড়িতে যেতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ। কুয়ার পাড়ে সারারাত বসে থাকব। কুয়াভূতের হাসি শুনব। তারা জলকেলি করবে, সেই শব্দও শুনব।

আপনি কি সত্যি যেতে যাচ্ছেন?

অবশ্যই।

চোখের ডাক্তার সাহেবের সমস্যা বিষয়ে এখন তাহলে ভাবছেন না?

মিসির আলি বললেন, সেই সমস্যার সমাধান তো করেছি। আর কী?

তাদের তো কিছু জানাচ্ছেন না!

মিসির আলি বললেন, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনি যুক্তির উপর যুক্তি দাঁড় করিয়ে সমস্যার সমাধান করে গভীর আনন্দ পাবেন। আপনার আনন্দ দেখতে ইচ্ছা করছে।

মিসির আলি হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? অনেক বড় রহস্য লুকিয়ে আছে মিতির কাছে।

আমি বললাম, কী রহস্য?

মিসির আলি তাঁর বিখ্যাত রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, আপনি চুপচাপ বসে না থেকে আমার চিঠিকন্যার সঙ্গে দেখা করে আসুন না। প্রাথমিক তদন্ত। আপনি আপনার মতো কথা। বলবেন, প্রশ্ন করবেন। শুধু একটা প্রশ্ন আমি শিখিয়ে দেব।

কোথায় দেখা করব, তাঁর বাসায়?

না। তাঁর কলেজে। তিনি চাচ্ছেন না তাঁর স্বামী চিঠির ব্যাপারটা জানুক। কাজেই মিটিং অফিসে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপিকা শায়লা আমাকে দেখে যথেষ্টই বিরক্ত হলেন। শিক্ষিত মানুষরা সুগার কোটেড কুইনাইনের মতো বিরক্তি আড়াল করতে পারেন। ভদ্রমহিলা ভদ্রভাবে আমাকে বসালেন। বেয়ারা ডেকে চ বিসকিট দিলেন। আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, শার্লক হোমসের সঙ্গে একজন সহকারী থাকেন। উনি অনেক বোকামি করেন। পাঠকরা তার বোকামি এবং ভুল লজিক পড়ে মজা পায়। আপনিও কি এমন একজন?

ভদ্রমহিলার কথায় অনেকটা থতমত খেয়ে গেলাম। যেসব কথা বলব বলে গুছিয়ে। রেখেছিলাম সবই এলোমেলো হয়ে গেল। আমি আমতা আমতা করে বললাম, মিসির আলি সাহেব অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।ব তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করার জন্যে।

একটা প্রশ্ন?

জি একটাই প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটা তো তিনি টেলিফোনেও করতে পারতেন। তা-না করে আপনাকে কেন। পাঠালেন?

শায়লার এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারলাম না। আরো হকচকিয়ে গেলাম।

শায়লা বললেন, চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

শায়লা বললেন, আমার একটা ক্লাস আছে। ক্লাসে যেতে হবে। হাতে সময় আছে সাত মিনিটের মতো। প্রশ্নটা করুন।

মিসির আলির শিখিয়ে দেয়া প্রশ্নটা করলাম। আমি নিজে যে সব প্রশ্ন করব বলে ঠিক করে রেখেছি সবই কপুরের মতো উবে গেল।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, আপনি মিসির আলি সাহেবের কাছে লেখা চিঠিতে লিখেছেন এপ্রিল মাসের এক তারিখ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারিখ ঠিক আছে তো?

অবশ্যই ঠিক আছে। April fools day= ভুল হবার কথা না।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন মিসির আলি সাহেব অনুসন্ধানের ব্যাপারে অত্যন্ত meticulus. তিনি খোঁজখবর করে জেনেছেন আপনার দুর্ঘটনার বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি ছিল।

শায়লা বললেন, অবশ্যই না।

আমি বললাম, আমি ঐ বছরের একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি দেখাব?

শায়লা হ্যাঁ-না বলার আগেই আমি কাঁধে ঝোলানো চটের ব্যাগ থেকে একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার বের করে তাকে দেখালাম। এপ্রিলের এক তারিখে লাল গোল চিহ্ন দেয়া। সরকারি ছুটি।

ভদ্রমহিলা থমত খেলেন না। কঠিন মুখ। করে বসে রইলেন। আমি বললাম, যদি অনুমতি দেন তাহলে উঠব। ভদ্রমহিলা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। আমার ডেস্ক ক্যালেন্ডার হাতে নিয়ে বসে রইলেন। তার ভাব-ভঙ্গি থেকে
মনে। হচ্ছে এই ক্যালেন্ডারটা তিনি হাতছাড়া করতে চান না। আমি ক্যালেন্ডার রেখেই ঘর থেকে বের হলাম।

মিসির আলি বলে দিয়েছিলেন শায়লার সঙ্গে দেখা করার পরপরই যেন আমি ডাক্তার হারুনের সঙ্গে কথা বলি। এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, কোন তারিখে আপনার বাচ্চাটা মারা গিয়েছিল? তারিখ জানা খুব জরুরি।

আমার ধারণা ছিল ডাক্তার হারুন আমাকে চিনতে পারবেন না। তিনি শুধু যে চিনলেন তানা, আমাকে মহাসমাদর করে বসালেন। যেন দীর্ঘদিন পর তিনি তার প্রিয় মানুষটার দেখা পেয়েছেন। সব কাজকর্ম ফেলে এখন তিনি জমিয়ে আড়া দেবেন।

আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাই কেমন আছেন বলুন তো?

আমি খানিকটা ব্রিত গলাতেই বললাম, ভালো।

খবর পেয়েছি মিসির আলি সাহেব হাসপাতালে। উনাকে আমার খুব দেখতে যাবার ইচ্ছা, সময় করতে পারছি না। উনি আছেন। কেমন?

আমি বললাম, ভালো আছেন। পানিভূত নিয়ে একটা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখছেন।

পানিভূতটা কী?

এরা পানিতে থাকে। প্রবহমান পানিতে না। দীঘিতে কিংবা পুরনো কুয়াতে।

জানতাম না তো!

হারুন এমনভাবে জানতাম না তো বললেন, যেন পৃথিবীর অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান থেকে তাকে। ইচ্ছা করে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি বললাম, ভূত প্রসঙ্গ থাক। আপনার যে ছেলেটি মারা গেছে তার সম্পর্কে বলুন। সে কবে মারা গেছে?

হারুন হতভম্ব গলায় বললেন, আমার তো। কোনো ছেলেমেয়েই হয় নি। মারা যাবে কীভাবে?

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম।

হারুন বললেন, সন্তান না হবার সমস্যাটা আমার। আমার স্ত্রীর না। আমার Sperm count খুব নিচে। ডাক্তার হিসেবে এই তথ্য আমি জানি। ভবিষ্যতেও যে আমার কোনো ছেলেমেয়ে হবে তা-না। আমার বাচ্চা হবে এই তথ্য আপনাকে কে দিল?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ভুল হয়েছে। কিছু মনে করবেন না।

হারুন বললেন, কিছু মনে করছি না। মানুষ ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। এখন বলুন, কী খাবেন? চা নাকি কফি। এক কাজ করুন, দুটাই খান। প্রথমে চা তারপরে কফি। চা-কফি খেতে খেতে পানিভূত বিষয়ে কী জানেন বলুন তো।

আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না। জানতে চাচ্ছিও না। এইসব অতিপ্রাকৃত বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

হারুন মহাউৎসাহে বললেন, আগ্রহ কেন থাকবে না? আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত নেই? রবীন্দ্রনাথ ভূত বিশ্বাস করতেন, এটা জানেন? প্ল্যানচেট করে আত্মা আনতে পছন্দ

করতেন। তিনি তার জীবনস্মৃতি'তে পরিষ্কার লিখেছেন। আপনি 'জীবনস্মৃতি' পড়েন নি? আমার কাছে আছে, আপনি ধার নিতে পারেন। তবে বই ধার নিলে কেউ ফেরত দেয় না, এটাই সমস্যা।

পুলিশ তদন্ত করে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়, আমিও শায়লার সন্তান বিষয়ে একটা ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করলাম। মিসির আলি সাহেবকে রিপোর্ট দেখিয়ে চমকে দেব এটাই আমার বাসনা। আমার ধারণা রিপোর্টটা ভালো
লিখেছি।

ডা. হারুনের সন্তানের মৃত্যুবিষয়ক জটিলতা

(ক) ডা. হারুনের কোনো সন্তান নেই, সন্তানের মৃত্যুর প্রশ্নও সেই কারণেই নেই।

ডা. হারুনের প্রকৃতি ভালো মানুষের প্রকৃতি। ভালো মানুষরা নিজের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, এই ভদ্রলোকও সেরকম। ভূত-প্রেত-আত্মা এইসব বিষয়ে তার বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস রক্ষার ব্যাপারে তিনি যত্নশীল। এটা দোষের কিছু না। এধরনের মানুষরা অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বলেন না। কাজেই তার কোনো সন্তান। নেই এমন মিথ্যা তিনি বলবেন না।

তারপরেও হারুন সাহেবের কথার সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আমি দু'জনের সঙ্গে কথা
বলেছি। একজন। হারুন সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার এবং অন্যজন হারুন সাহেবের বাড়ির কেয়ারটেকার নাজমুল।

নাজমুলের অনেক বয়স। হারুনের জন্মের আগে থেকেই তাদের বাড়ির কেয়ারটেকার। স্ট্রোকের কারণে ডানহাত এবং পা নাড়াতে পারেন না। মুখের কথাও অস্পষ্ট এবং জড়ানো। তবে তার সেন্সেস পুরোপুরি কাজ করছে। আমার প্রশ্নের
জবাবে বললেন—

আমার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে নাই। আমি বিবাহ করি নাই। আমি মনে করি। আমার ছেলে হারুন। আমি তাকে কোলেপিঠে বড় করেছি। ঘাড়ে করে স্কুলে নিয়ে গেছি। স্কুল থেকে এনেছি। তার কোনো সন্তানাদি হয় নাই, এই দুঃখ হারুনের চেয়ে আমার অনেক বেশি। আর অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকব। হারুনের বাচ্চার মুখে দাদু ডাক শুনব না, এই কষ্টের কোনো সীমা নাই।

ডা. হারুনের ড্রাইভারের সাথে আমার যে কথা হয়েছে তা এরকম–

আমি : তোমার নাম?

ড্রাইভার : স্যার, আমার নাম ফজলু। ফজলু মিয়া।

আমি : তুমি ডাক্তার সাহেবের গাড়ি কতদিন ধরে চালাচ্ছ?

ড্রাইভার : হিসাব নাই। কাজ শিখার পরে প্রথম স্যারের। এখানে কাজ নেই। খুব কম হইলেও দশ বছর ধইরা স্যারের সাথে আছি।

আমি : তোমার ডিউটি কেমন?

ড্রাইভার : আমার ডিউটি নাই বললেই চলে। স্যারের সন্তানাদি নাই, ইস্কুল ডিউটিও নাই।

আমি : ম্যাডামের ডিউটি কর না?

ড্রাইভার : ম্যাডামের আলাদা গাড়ি। আলাদা ড্রাইভার।

(খ) সন্তানবিষয়ক মিথ্যা কথাটা শায়লা বানিয়ে বলেছেন। এমন একটা ভয়ঙ্কর কথা উনি কেন বানালেন সেটা খুব পরিষ্কার না। আমার ধারণা তিনি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে একটা বুদ্ধির খেলা খেলেছেন। মিসির আলি একজনকে শিশুর হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করার পর তিনি বলবেন, কোনো শিশুর অস্তিত্বই নাই। সম্মানিত মানুষকে ছোট করে অনেকে আনন্দ পায়। শায়লা সেরকম একজন বলে আমার ধারণা।

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে আমার রিপোর্ট পড়লেন। এবং হাসিমুখে বললেন, রিপোর্ট ঠিক আছে,
তবে ...।

আমি বললাম, রিপোর্ট ঠিক থাকলে তবে আসবে কেন?

মিসির আলি বললেন, তবে আসছে, কারণ হারুন সাহেবের কোনো ছেলে পহেলা এপ্রিল মারা যায় নি বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা যুক্তিনির্ভর না। আপনি হারুন সাহেবের কথা, তাঁর কেয়ারটেকার এবং ড্রাইভারের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন। তারা কেন মিথ্যা বলবে? হারুন সাহেবের স্ত্রীইবা কেন মিথ্যা বলবে?

আমি বললাম, হারুন সাহেবের স্ত্রীর মিথ্যা বলার কারণ কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি। তিনি আপনার সঙ্গে একটা খেলা খেলছেন।

মিসির আলি বললেন, এই খেলা তো হারুন সাহেবও খেলতে পারেন। পারেন না?

আমি বললাম, তাঁর বাড়ির বাকি দু'জন তো কোনো খেলা খেলবে না। তাদের স্বার্থ কী?

অন্নদাতা মুনিবকে রক্ষা করা স্বার্থ হতে পারে। বাড়ির বিশ্বাসী পুরনো লোকজন মুনিবের প্রতি Loyal থাকে।

আমি বললাম, আপনি কি তাহলে ধারণা করছেন যে পহেলা এপ্রিল সত্যি সত্যি বাচ্চাটা খুন হয়েছে?

মিসির আলি বললেন, সেরকম ধারণাও করছি না। তবে আমি মনে করি ঐ তারিখে ডাক্তার হারুনের কোনো বাচ্চা মারা গিয়াছিল কি-না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াটা খুব জরুরি।

আমি বললাম, কীভাবে নিশ্চিত হব? বাংলাদেশে তো জন্ম-মৃত্যুর কোনো রেকর্ড থাকে না।

মিসির আলি বললেন, জন্মরেকর্ড থাকে না, মৃত্যুরেকর্ড কিন্তু থাকে। গোরস্থানে থাকে। গোরস্থানের অফিসে কার কবর হলো তা লেখা। থাকবে।

আমাকে এখন গোরস্থানে গোরস্থানে ঘুরতে হবে?

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, অবশ্যই। আপনি একটা রহস্যের মীমাংসা করবেন, বিনা পরিশ্রমে তা কি হয়?

আমি বললাম, আপনি তো বিনা পরিশ্রমেই রহস্যের মীমাংসা করে ফেলেছেন। অনেক আগেই খামে লিখে আমাকে দিয়েছেন।

মিসির আলি বললেন, বিনা পরিশ্রমে করি নি। অনেক পরিশ্রম করেই সিদ্ধান্তে এসেছি। কঠিন এক অংক ধাপে ধাপে করে সিদ্ধান্তে এসেছি। আপনার পক্ষে গোরস্থানে গোরস্থানে। ঘোরা সম্ভব হবে না আমি বুঝতে পারছি। এক কাজ করুন, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কাউকে লাগিয়ে দিন, যে আপনার হয়ে কাজটা করবে। পাঁচশ টাকা খরচ করলেই হবে।

আমাকে এক হাজার টাকা খরচ করতে হলো। গোরস্থান থেকে গোরস্থানে যাবার ভাড়া পাঁচশ টাকা। কাজটার জন্যে পাঁচশ' টাকা। জানতে পারলাম ঢাকা শহরে ঐ তারিখে। এগারোজন শিশু মারা গেছে। এর মধ্যে পাঁচজন মেয়ে। ছয়জন ছেলের মধ্যে চারজনের বয়স চার বছরের বেশি। এরা বাদ। বাকি দু'জনের একজন জন্মের পরপরই মারা গেছে। সেও বাদ। একজন শুধু মারা গেছে এক বছর বয়সে। তার নাম মিজান। তার বাবা আলহাজ আব্দুল লতিফ। থাকেন পুরনো ঢাকায়।

আমি আমার রিপোর্টে লিখলাম নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি পহেলা এপ্রিলে হারুন সাহেবের কোনো সন্তান মারা যায় নি।

রিপোর্টটা লিখে শান্তি পেলাম না। মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। আমার ধারণা এর মধ্যেও মিসির আলি কিছু ভুল বের করে ফেলবেন। আবার আমাকে নতুন করে ছোটাছুটি

শুরু করতে হবে। হয়তো মিসির আলি বলবেন, আলহাজ আব্দুল লতিফ সাহেবের ইন্টারভ্যু নিতে।

অনেক চিন্তাভাবনা করে আমি একটা সহজ পথ বেছে নিলাম। মিসির আলি সাহেবের খামটা খুলে ফেললাম। সেখানে লেখা

“ধৈর্য ধরতে পারলেন না? আগেভাগেই খাম খুলে ফেললেন? যাইহোক, হত্যাকারীর নাম লিখছি। সাংকেতিকভাবে লিখছি। দেখি সংকেত ভেদ করতে পারেন কিনা। হত্যাকারীর নাম–

‘আ মারপ এক ন্যা।’

আমার মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া উপায় রইল না। সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার আমার কর্ম না। মিসির আলি সাহেবের নির্দেশ মতো অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া এরচে’ সহজ। মনে হচ্ছে পেতেছি সমুদ্রে শয্যা।

৫. ভূতবিষয়ক প্রবন্ধ

মিসির আলি হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন এবং গভীর আগ্রহে রাত জেগে ভূতবিষয়ক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। পানিভূত বিষয়ে আগেই লেখা হয়েছে। এখন লিখছেন বৃক্ষবাসী ভূত। যেসব ভূত গাছে বাস করে তাদের নিয়ে জটিল প্রবন্ধ। যা লেখেন সেটা আমাকে ঘুমুতে যাবার আগে পড়ে শোনান। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না নিতান্ত ফালতু কাজে এই মানুষটা কেন তার মেধা নষ্ট করছে। ভূতবিষয়ক আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করছি। একটা শিশু যদি গভীর আগ্রহে কোনো খেলা খেলে সেই খেলায় বাধা দিতে নেই। ভূতবিষয়ক গবেষণা শিশুর খেলা ছাড়া আর কী? শিশুর খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া সাধারণ নর্মের মধ্যে পড়ে।

রাতে দু'জন খেতে বসেছি, মিসির আলি বললেন, বলুন তো দেখি কোন কোন গাছে ভূত থাকে?

আমি বললাম, জানি না। আমি এখন পর্যন্ত কোনো গাছে ভূত থাকতে দেখি নি।

মিসির আলি বললেন, চার ধরনের গাছে ভূত থাকে। বেলগাছ, তেঁতুলগাছ, শ্যাওড়াগাছ এবং বাঁশগাছ। এর বাইরে কোনো গাছে থাকে না। আম এবং কাঁঠাল গাছে ভূত থাকে এরকম কথা কখনো শুনবেন না।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

মিসির আলি বললেন, ভূত মানুষের কল্পনা, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষ কেন ভূত থাকার জন্যে চারটা মাত্র গাছ বেছে নিল এটার গবেষণা হওয়া দরকার।

এই গবেষণায় আমাদের লাভ?

মিসির আলি বললেন, এই গবেষণা মানুষের কল্পনার জগৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবে।

আমি বললাম, শ্যাওড়া ঘন আঁকড়া গাছ। দিনেরবেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে।

সেইজন্যেই মানুষ শ্যাওড়া গাছকে ভূতের জন্যে বেছে নিয়েছে।

মিসির আলি বললেন, বেলগাছ তো কঁকড়া গাছ না। ছায়াদায়িনী বৃক্ষও না। তাহলে বেলগাছ বাছল কেন?

বেলগাছে কাঁটা আছে এই কারণে। ভূতরা হয়তো কাঁটা পছন্দ করে।

তেঁতুল এবং বাঁশ গাছে তো কাঁটা নেই। ভূতরা তাহলে ঐ গাছে কেন থাকছে?

আমি চুপ করে গেলাম। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে বললাম শায়লার পুত্রের মৃত্যুরহস্য ভেদের কাজটা শেষ করে ভূতের গবেষণাটা করলে ভালো হয় না?

মিসির আলি বললেন, রহস্য তো অনেক আগেই ভেদ হয়েছে। উত্তর লিখে খামে সীলগালা করে আপনার হাতে দিয়েছি। এখন আপনার দায়িত্ব নিজের মতো করে রহস্যের মীমাংসায় আসা।

কোন দিকে আগাব বুঝতে পারছি না তো।

আমার চিঠিকন্যা শায়লা আমাকে যে চিঠি লিখেছে সেটা ধরে আগাবেন।

সেটা ধরে আগানোর তো আর কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই আছে। চিঠিতে লেখা— ডা. হারুন চোখের কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর একটা পদ্ধতি বের করেছে, যার নাম Haroon's Cornia grafting. দেখতে হবে আসলেই এমন কোনো পদ্ধতি ডাক্তার হারুন বের করেছে কি-না?

তার প্রয়োজনটা কী? উনি এই পদ্ধতি বের না করলেও তো কিছু আসে যায় না। শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

মিসির আলি বললেন, রহস্যভেদের জন্যে কোনো তথ্যই অপ্রয়োজনীয় না।

আমি বললাম, গ্রাফটিংবিষয়ক তথ্য পাব কোথায়?

মিসির আলি বললেন, সব মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরিতে জার্নাল আছে। সেখান। থেকে পাবেন। তারচেয়েও সহজ বুদ্ধি হলো Internet. Haron's cornia grafting লিখে সার্চে দিলেই পাওয়া যাবে। আমি তো সেভাবেই বের করেছি। এবং আপনার কম্পিউটারেই বের করেছি।

কী পেয়েছেন?

সেটা তো আপনাকে বলব না। আপনি রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আপনি নিজে বের করবেন।

এক্ষুনি বের করছি।

মিসির আলি বললেন, ভেরি গুড। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা না। ইন্টারনেট আমাদের জীবন অনেক সহজ করে দিয়েছে।

ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখা গেল Haroon's Cornia grafting বলে কিছু নেই, তবে Jalal Ahmed's Cornia grafting বলে নতুন এক পদ্ধতি আছে।

মিসির আলিকে এই তথ্য দিতেই তিনি বললেন, জালাল আহমেদ মুসলমান নাম। তার মানে এই না যে তার দেশ বাংলাদেশ। সে পাকিস্তানি হতে পারে, মিডল ইস্টের হতে পারে। আপনার কাজ হচ্ছে মেডিকেল কলেজগুলিতে খোজ নেয়া এই নামে কোনো ছেলে পাশ করেছে কি না।

আমি হতাশ গলায় বললাম, আপনি কি এইভাবেই রহস্য ভেদ করেন?

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই। দ্বিতীয় বিকল্প তো নেই। যাইহোক, আপনার এই কাজটা সহজ করে দিচ্ছি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি জালাল আহমেদ নামে অসম্ভব ব্রিলিয়েন্ট একজন ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে। সে যে শুধু ব্রিলিয়েন্ট তা-না, সে রাজপুত্রের মতো রূপবান। তাকে প্রিন্স নামে ডাকা হতো।

আমি শুধু বললাম, ও আচ্ছা। জালাল আহমেদ নামে নতুন এই চরিত্রটির সঙ্গে রহস্যের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না। জট খুলতে গিয়ে আরো জট পাকিয়ে দিচ্ছি এই হলো সমস্যা। মিসির আলির রহস্যভেদ প্রক্রিয়া যে এমন ঝামেলার তাও আগে বুঝি নি। এখানে-ওখানে যাওয়া, ঘোরাঘুরি, বিরাট পরিশ্রমের ব্যাপার।

মিসির আলি বললেন, আমার চিঠিকন্যার চিঠিটা মনে করুন। সেখানে লেখা আমার স্বামী রাজপুত্রের মতো। এখন আপনি বলুন, হারুন সাহেব কি রাজপুত্রের মতো?

না।

হারুন'স কর্নিয়া গ্রাফটিং বলে কিছু নেই, অথচ জালাল আহমেদ'স কর্নিয়া গ্রাফটিং আছে। যে জালাল রাজপুত্রের মতো সুন্দর। কিছু কি বোঝা যাচ্ছে?

আমি হতাশ গলায় বললাম, না।

মিসির আলি বললেন, আমার চিঠিকন্যা হাসপাতালের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটা পড়ে দেখতে পারেন। আরো কোনো ক্লু যদি পাওয়া যায়।

আমি বললাম, চিঠি পড়ে ক্লু বের করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আগের চিঠিতে কিছু পাই নি, এই চিঠিতেও কিছু পাব না।

মিসির আলি হো হো করে আসছেন, যেন। আমি খুবই মজার কোনো কথা বলেছি।

এইবারের চিঠিটা আমি পরপর তিনবার পড়লাম। আগের চিঠি মিসির আলি তিনবার পড়তে বলেছিলেন, এই কারণেই এই চিঠিও তিনবার পড়া। চিঠিটা হলো–

বাবা,

আমি আপনার চিঠিকন্যা শায়লা। আপনার শরীর খারাপ এবং আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, এই খবর আমি হারুনের কাছ থেকে পেয়েছি। সে আপনার সব খবর রাখে। আপনি যে একজন লেখকের বাড়িতে উঠেছেন, এই খবরও তার কাছে পেয়েছি। আমার ধারণা সে আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়েছে।

বাবা, আপনাকে যে কথা বলার জন্যে চিঠি লিখছি তা হলো ক্ষমা প্রার্থনা। মিথ্যা কথা। বলে আপনার সময় নষ্ট
করেছি, এইজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা। আমি অত্যন্ত ছেলেমানুষি একটা কাজ করেছি। বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। আমার ছেলের মৃত্যুর কথা। আপনাকে রহস্য ভেদ করতে বলেছি। কারণটা ব্যাখ্যা করি। আমি আপনাকে নিয়ে লেখা প্রায় সব বইই পড়েছি। হঠাৎ ইচ্ছা হলো অতি বুদ্ধিমান মিসির আলিকে বিভ্রান্ত করা যায় কি-না। দেখা যাক।

আমার ধারণা ছিল চিঠি পড়েই আপনি বুঝবেন পুরোটাই বানানো। তা-না করে আপনি যে রীতিমতো গবেষণা শুরু করেছেন। তা জানলাম যখন আপনি আপনার লেখক বন্ধুকে আমার কাছে পাঠালেন। আপনার লেখক বন্ধু বললেন, ঐ বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি। মিথ্যা বলার এই বিপদ।

সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটলে আমার মনে থাকতো সে বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি ছিল।

বাবা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে বাবা ডেকেছি, কাজেই কন্যা হিসেবে ক্ষমা পেতে
পারি।

আমার ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে আপনার সঙ্গে দেখা করা। চক্ষুলজ্জায় দেখা করতে পারি নি।

বাবা, আপনি আমাকে যদি ক্ষমা করেন তাহলেই একদিন এসে আপনাকে দেখে যাব। আমার এতই খারাপ লাগছে, ইচ্ছা করছে KCN খেয়ে মরে যাই।

ইতি
চিঠিকন্যা শায়লা

তিনবার চিঠি পড়ার পর আমি বললাম, আমি যা ভেবেছিলাম ঘটনা তো সেরকমই। মামলা ডিসমিস।

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, মামলা মাত্র শুরু। ডিসমিস মোটেই না। আমি মেয়েটিকে সোমবার সন্ধ্যায়
আসতে বলেছি। রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি। এর মধ্যে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে জালাল আহমেদের একটা ছবি জোগাড় করতে হবে।

কোত্থেকে জোগাড় করব?

আমি বলে দেব কোত্থেকে।

আর কিছু করতে হবে?

ডাক্তার হারুনের সঙ্গে ভূতবিষয়ক একটা মিটিং। আপনি তাঁকে ভূতবিষয়ক নানান তথ্য দেবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভূতবিষয়ে আমি কী তথ্য দেব? আমি তো কিছুই জানি না।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আমি শিখিয়ে দেব।

এতে লাভ কী হবে?

পরকালে বিশ্বাসী লোকজন মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে অনেক কর্মকাণ্ড করে, যেমন প্ল্যানচেট, চক্র। আমি শুধু জানতে চাই তিনি মৃত কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কিনা।

আমি বললাম, ভূত-প্রেত বিষয়ক আলোচনায় আপনি থাকবেন তো?

মিসির আলি না-সূচক মাথা নাড়লেন। ভাবলেশহীন গলায় বললেন, পুরো প্রক্রিয়াটি আমি আপনাকে দিয়ে করাতে চাই। নিজে নিজে রহস্যভেদ করতে চাচ্ছিলেন সেই সুযোগ করে দিচ্ছি। তবে এখনো সময় আছে। আপনি যদি সরে আসতে চান সরে আসবেন।

আমি সরে আসতে চাই না।

ডা. হারুনের সঙ্গে ভূতবিষয়ক আলোচনা তেমন জমল না। তিনি সেদিন কথা বলার মুডে ছিলেন না। তবে তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর নিজেরও প্ল্যানচেটের উপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর মা জীবিত থাকার সময় মা'র সঙ্গে অনেকবার প্ল্যানচেট করেছেন। প্ল্যানচেটে সাধারণ মানুষের আত্মা যেমন এসেছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মাও এসেছে। প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি সুকান্ত, নবাব সিরাজউদ্দৌলা...। তাঁর কাছ থেকে জানলাম তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শায়লা একবারই বসেছিলেন প্ল্যানচেটে। খুবই বাচ্চা একটা ছেলের আত্মা এসে উপস্থিত হয়। শায়লা এই ঘটনায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আর কখনো প্ল্যানচেটে বসেন নি।

আমি বললাম, বাচ্চা ছেলেটা কি তার নাম বলেছে?

হারুন বলেছেন, নামের আদ্যক্ষর বলেছে। বলেছে 'S', আপনি নিজে উৎসাহী হলে আপনাকে নিয়ে একদিন
বসব। ভয়ের কিছু নেই। একটা বোতামে আমি এবং আপনি আঙুল চেপে বসব। বোতামটা থাকবে
উইজা বোর্ডে।

আমি বললাম, উইজা বোর্ডটা কী?

একটা কার্ড বোর্ড। সেখানে A থেকে Z পর্যন্ত অক্ষরগুলি লেখা। এক জায়গায় Yes এবং | No লেখা। যখন বোতামে আত্মার ভর হবে। তখন আত্মা কঁপতে থাকবে। আত্মাকে তখন প্রশ্ন করবেন, আপনি কি এসেছেন? আত্মা তখন। বোতামটা টেনে Yes-এর ঘরে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপ্যাল। বুঝেছেন?

কিছুটা। কাছ থেকে না দেখলে পুরোপুরি বুঝব না।

একদিন রাতে মিসির আলি সাহেবকে নিয়ে বাসায় চলে আসবেন। হাতেকলমে দেখাব।

আমি বললাম, হাতেকলমে তো দেখাবেন না। আপনি দেখবেন আঙুলে বোতামে।

আমার রসিকতায় হারুন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আজ আমি ব্যস্ত আছি। অন্য একদিন আসুন।

আমি উঠে পড়লাম। ভূতবিষয়ক এই আলোচনা থেকে মিসির আলি কী উদ্ধার করবেন আমি বুঝতে পারছি না। বাচ্চা
একটা ছেলের আত্মা এসেছিল যার নামের আদ্যক্ষর ‘s’, এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে। তবে আমি লক্ষ করেছি, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যই মিসির আলির কাছে গুরুত্বহীন। এই ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হবে।

ডা. হারুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জালাল আহমেদের ছবির খোজে বের হলাম। জালাল আহমেদের মা মারা গেছেন। বাবা একা বেইলী রোডের এক ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। অনেক ঝামেলা করে জালাল সাহেবের বাবার সঙ্গে

দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। বৃদ্ধ আমাকে শীতল গলায় বললেন, আমি আপনাকে চিনি না, জানি না। কোনোদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়। নি।

আপনাকে আমি আমার ছেলের ছবি কেন। দেব? আপনি তো দূরের কথা, আমি তো আমার আত্মীয়স্বজনকেও কোনো ছবি দেব না। আমার ছেলে মারা গেছে, ধরে নেন তার ছবিও মারা গেছে।

আপনার ছেলে মারা গেছে তা তো জানতাম না। কবে মারা গেছে?

কবে মারা গেছে জেনে কী করবেন? মিলাদ পড়াবেন? অনেক কথা বলে ফেলেছি, যান। বিদায় হোন।

আমি দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়ালভর্তি এক যুবকের নানান ভঙ্গিমার সুন্দর সুন্দর ছবি। রাজপুত্রের মতো রূপবান সেই যুবক বসার ঘরের দেয়াল আলো করে রেখেছে। এই যুবক যে জালাল আহমেদ তাতে সন্দেহ নেই। একটি ছবি এত সুন্দর যে সেই ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার করা যায়। যুবক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে নীল সমুদ্র। যুবকের চোখে বিষন্নতা। তার হাতে একটা মগ। মনে হচ্ছে সে মর্গে করে কফি খাচ্ছে।

আমি বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার ছেলের ছবি?

বৃদ্ধ দাঁত মুখ খিচিয়ে বললেন, আমার ছেলের ছবি না। পাড়ার ছেলের ছবি। পাড়ার ছেলের ছবি দিয়ে আমি দেয়াল ভর্তি করে রেখেছি।

আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম, পুরুষমানুষ যে এত রূপবান হতে পারে এই প্রথম দেখলাম।

এই কথাতেই কাজ হলো। বৃদ্ধের চোখ থেকে কাঠিন্য মুছে গেল। সেখানে চলে এলো এক ধরনের বিষন্নতা। বৃদ্ধ বললেন, চা খাবেন?

আমি বললাম, চা না, কফি খেতে ইচ্ছা করছে। জাহাজের ডেকে আপনার ছেলের কফি খাওয়া দেখে আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে। আপনার বাসায় কফির ব্যবস্থা কি আছে?

বৃদ্ধ বললেন, অবশ্যই আছে। আমার ছেলে যে মগে করে কফি খাচ্ছে সেই মগটাও আছে। ঐ মগে করে খেতে চান?

আমি বললাম, এত সৌভাগ্য আমি আশা করছি না। কফি হলেই আমার চলবে।

বৃদ্ধ আমাকে ছেলের কফি মগেই কফি দিলেন। চোখ মুছতে মুছতে ছেলের মৃত্যুর ঘটনা বললেন। নিউইয়র্কের সাবওয়েতে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যু।

জালাল আহমেদের ছবি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। জাহাজে কফি খাওয়ার ছবিটাই আমাকে দিলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমার ছেলের এই ছবিটা আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি নিয়ে যান। ফেরত দিতে হবে না। ছবি আপনার কেন দরকার, ছবি দিয়ে কী করবেন কিছুই জানতে চাচ্ছি না। আজকাল কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না। কফি খেতে চাইলে আমার কাছে এসে কফি খেয়ে যাবেন। আমার ছেলের কফি খুব পছন্দ ছিল। মৃত্যুর সময়ও তার হাতে কফির কাপ ছিল।

৬. ডিনারের নিমন্ত্রণ

আজ সোমবার।

মিসির আলি সাহেবের চিঠিকন্যা শায়লার আমাদের এখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। টেলিফোনে জানিয়েছেন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চলে আসবেন।

আমি কয়েকটি কারণে কিছুটা উত্তেজনার মধ্যে আছি। প্রথম কারণ, অতিথির জন্যে রান্নার দায়িত্ব পড়েছে আমার। মেনু মিসির আলি ঠিক করে দিয়েছেন

স্টার্টার : জিরাপানি

সাইড ডিস : বেগুন ভর্তা, টমেটো ভর্তা।

মেইন ডিস : ইস্ত্রি ইলিশ

ফিনিশিং : মুগের ডাল

ডেজার্ট : দৈ।

মেইন ডিস নিয়ে আমি যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। মেইন ডিসের নামই দুশ্চিন্তার জন্যে যথেষ্ট ইস্ত্রি ইলিশ। এই রান্না মিসির আলির আবিষ্কার। ইলিশ মাছে সর্ষে বাটা, কাঁচামরিচ এবং লবণ দেয়ার পর লাউপাতা দিয়ে মুড়তে হবে। তারপর গরম ইস্ত্রির নিচে বসিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর মাছ উল্টে আবার ইস্ত্রি চাপা। দেয়া। ইস্ত্রি দিয়ে কতক্ষণ চাপা দিয়ে

রাখতে হবে, সেই সম্পর্কে মিসির আলি কিছু বলছেন না। আমার ধারণা মেইন ডিস হবে কাঁচামাছ।

মিসির আলিকে এই কথা বলতেই তিনি বললেন, কাঁচামাছ তো খারাপ কিছু না। জাপানিরা সুসি খায়। সুসি বানানো হয় কাঁচামাছ দিয়ে।

সমস্যা হচ্ছে আমরা জাপানি না, কাঁচামাছ খেতে অভ্যস্ত না। কাজেই আমি সকাল থেকে Stop watch দিয়ে ইস্ত্রিচাপা দেয়ার সময়টা বের করার চেষ্টা করছি। একটা ইলিশ মাছের লেজ এবং মাথা ছাড়া পুরোটাই নষ্ট হয়েছে। এখন Experient শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ইলিশ মাছ দিয়ে। যথেষ্টই টেনশন বোধ করছি। আমি একদিনের টেনশনেই অস্থির, বাংলাদেশের মেয়েরা রোজই এই টেনশনের ভেতর দিয়ে যায়— এটা ভেবে খুব অবাক লাগছে।

সন্ধ্যা থেকে ঝুম বৃষ্টি।

সাতটার মধ্যে ঢাকা শহরের সব রাস্তায় পানি। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাটায় কাটায় সাতটায় শায়লা উপস্থিত হলেন। তখনি। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আমার মাথায় হাত। ইলেকট্রিসিটি ছাড়া বিখ্যাত ইস্ত্রি ইলিশ তৈরি হবে না।

বসার ঘরের টেবিলে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। মোমবাতির আলোয় শায়লা নামের মহিলাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। অধ্যাপিকারা পড়াতে জানেন, সাজতে জানেন না কথাটা ঠিক না। শায়লা অতি বিনয়ের সঙ্গে মিসির আলিকে কদমবুসি করতে করতে বললেন, ভুলভাল চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করেছি। বাবা আমাকে ক্ষমা করেছেন তো?

মিসির আলি হাসলেন। শায়লা বললেন, ক্ষমা করে থাকলে মাথায় হাত রাখুন। মিসির আলি মাথায় হাত রাখলেন। সুন্দর সন্ধ্যা শুরু হলো। আমরা তিনজন একসঙ্গে বসেছি। আমাদের সামনে লেবু চা। ঝড়-বৃষ্টির রাতে লেবু চায়ে চুমুক দিতে অসাধারণ লাগছে। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। এখন মনে হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টির রাতে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া এমন খারাপ কিছু না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কি সব সময় পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখ?

শায়লার মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। শায়লার কথা বাদ থাকুক, আমি নিজেই। হকচকিয়ে গেলাম। শায়লা যদি তার হ্যান্ডব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড রেখেও থাকেন মিসির আলির পক্ষে তা জানা কোনোক্রমেই সম্ভব না। উনার আর যাই থাকুক। X-ray চোখ নেই।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, তোমার ব্যাগে পটাসিয়াম সায়ানাইডের একটা ফাইল আছে কী করে সেটা বুঝলাম তোমাকে বলি। পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে তোমার অবসেশান। আছে। শ্বশুরবাড়িতে এই শব্দটা তুমি প্রায়ই উচ্চারণ করো। যে কারণে তোমার শাশুড়িও শব্দটি শিখেছেন এবং তার পুত্রকে সাবধান করেছেন।

কেমিস্ট্রির শিক্ষক হিসেবে পটাশিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করা তোমার পক্ষে কোনো বিষয় না। তারচেয়েও বড় কথা তুমি M. S করেছে New York ইউনিভার্সিটি থেকে। তোমার থিসিস ছিল কোনো একটি Inorganic যৌগে KCN-এর সাহায্যে Carbon যুক্ত করা। Inorganic যৌগের নামটা যেন কী?

শায়লা যন্ত্রের মত বললেন, সিলিনিয়াস হাইড্রাইড।

মিসির আলি বললেন, এই ঘরে ঢোকার পর থেকে লক্ষ করছি, তুমি তোমার হ্যান্ডব্যাগ শরীরের সঙ্গে শুধু যে জড়িয়ে রেখেছ তা-না, শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকেও রাখছ। বাতাসের ঝাপটায় একবার তোমার শাড়ির আঁচল সরেও গেল। তুমি সঙ্গে সঙ্গে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে তোমার ব্যাগটা ঢাকলে। এখন বলো তোমার ব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে না? তুমি যদি বলো নাই তাহলে নাই। আমি তোমার ব্যাগ খুলে দেখব না।

শায়লা বিড়বিড় করে বললেন, পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে। ত্রিশ গ্রামের একটা ফাইল।

চোখ কপালে উঠার ব্যাপারটা বাগধারায় আছে। বাস্তবে এই ঘটনা কখনো ঘটে না। ঘটার সামান্য সম্ভাবনা থাকলে আমার চোখ কপালে উঠে থাকত।

মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে একটা খাম রাখতে দিয়েছিলাম। খামটা আজ ভোলা হবে এবং খামে কী লেখা পড়া হবে।

আমি খাম এনে নিজের জায়গায় বসলাম। মিসির আলি শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি প্রথম চিঠিতে জানতে চেয়েছিলে তোমার পুত্র সাগরের হত্যাকারী কে তা তুমি জানো। আমি জানি কি-না? আমিও জানি। সেটা একটা কাগজে লিখে রাখতে দিয়েছিলাম। তোমার সামনে একদিন খুব এই আশায়। এখন খোলা হবে।

মিসির আলি বললেন, কাগজে কী লেখা পড়ুন।

আমি বললাম, কাগজে লেখা

‘আ মারপ এক
ন্যা’।

মিসির আলি বললেন, অতি সহজ সাংকেতিক ভাষায় লিখেছি। অক্ষরগুলি আগ পিছে করলেই মূলটা বের হবে।

আমি লিখেছি–

‘আমার পত্র
কন্যা।‘

আমি শায়লার দিকে তাকালাম, তার চেহারা ভাবলেশহীন। কী ঘটছে না ঘটছে তা সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মিসির আলি বললেন, ডায়লা তুমি বিয়ের পর M.S. করতে আমেরিকা যাও, ঠিক না?

শায়লা হা-সূচক মাথা নাড়ল।

জালাল আহমেদের সঙ্গে সেখানেই তোমার পরিচয়?

হ্যাঁ।

সাগর নামের ছেলেটি কি তোমাদের অবৈধ সন্তান?

শায়লা মুখ তুলে তাকালেন এবং কঠিন গলায় বললেন, না। আমি হারুনকে নিয়মমাফিক তালাক দিয়ে জালালকে বিয়ে করি। হারুনের সঙ্গে এমনিতেই আমার বিয়ে বৈধ ছিল না। আপনি এত কিছু জেনেছেন, এই তথ্যও নিশ্চয়ই জানেন সে Impotent.

জানি।

পুরো ইসলামি মতে নিউইয়র্কের এক মসজিদে আমাদের বিয়ে হয়। তারপরই সমস্যা শুরু হয়।

কী সমস্যা?

তার ধারণা হয় আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। যে-কোনো সময় তাকে আমি খুন। করতে পারি। এইসব হাবিজাবি।

ডা. হারুনের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা?

হ্যাঁ।

আমাদের যে বাচ্চাটা হয়–সাগর, সেই বাচ্চাটাকে জালাল সরিয়ে ফেলেছিল। তার ধারণা হয়েছিল বাচ্চাটাকেও আমি মেরে ফেলব। সে সাগরকে তার এক আত্মীয় বাড়িতে সরিয়ে দিয়েছিল যাতে আমি বুঝতে না পারি সে কোথায়। আমি ইচ্ছা করলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাচ্চা বের করে ফেলতে পারতাম। তা করি নি। নিজেই খুঁজে খুঁজে বের করেছি সে

কোথায় আছে। আমি আমার ছেলের খোঁজে জ্যাকসন হাইটের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জানলাম, তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি এক কাপ কফি খাব। কফি কি আছে? মানুষ চলে যায় তার কিছু অভ্যাস রেখে যায়। জালাল নেই কিন্তু তার কফির অভ্যাস আমার মধ্যে রেখে গেছে।

আমি কফি বানিয়ে শায়লার সামনে ধরলাম। শায়লা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বলল, জালাল যে নিউইয়র্কের এক সাবওয়েতে কফি খেতে খেতে মারা গিয়েছিল এই খবর কি আপনি জোগাড় করেছেন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

সে হার্ট এটাকে মারা যায় নি। কফিতে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে খেয়েছিল। সে সুইসাইড করেছিল। পটাশিয়াম সায়ানাইড চুরি করেছিল আমার কাছ থেকে। নিউইয়র্ক পুলিশের বুদ্ধির কত নামধাম শুনি, তারা ধরতে পারে নি। তারা ভেবেছে হার্ট এটাক।

তার মৃত্যুর পর আমি দেশে ফিরে আসি। বাস করতে থাকি হারুনের সঙ্গে। এমনভাবে বাস করি যেন মাঝখানের দু'টা বছর হঠাৎ বাদ পড়ে গেছে। হারুন কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে নি। আমিও কিছু বলিনি। আমার শাশুড়ি ব্যাপারটা একেবারেই মেনে নেন নি। তিনি আমাকে হজম করেছেন কারণ আমাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আমি জালালকে খুন করে ফিরে এসেছি তার ছেলেকে খুন করতে। বাবা, আপনার বুদ্ধি আপনার লজিকের সিঁড়ি তৈরি করার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই। আমি ব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে ঘুরি— এটা পর্যন্ত বের করে ফেলেছেন। কিন্তু আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ছিল ভুল।

মিসির আলি বললেন, তোমার ছেলে সাগর কোথায় আছে?

সে তার দাদুর সঙ্গে থাকে। ঐ বাড়িতে আমার যাওয়া নিষেধ। তবে হারুন ঐ বাড়িতে যায়। আমার ছেলে তাকে খুব পছন্দ করে। হারুনই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। ছেলেটি তার বাবার চেয়েও অনেক সুন্দর হয়েছে।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। আমি ইস্ত্রি ইলিশ বানানোয় ব্যস্ত। মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্ত। সন্ধ্যার পর থেকে অনেক ঘটনা এত দ্রুত ঘটেছে যে তাল রাখতে সমস্যা হচ্ছে। শায়লা পুরোপুরি সত্যি বলছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না। মিসির আলিকে দেখে কিছু বুঝতে পারছি না।

রাত নটায় দরজার কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খোলার জন্যে উঠে দাঁড়াল শায়লা। লজ্জিত গলায় বলল, আমি হারুনকে রাত নটায় ডিনার খেতে এখানে আসতে বলেছি। ওকে বাদ দিয়ে ডিনার খেতে খুব খারাপ লাগবে।

মিসির বললেন, ভালো করেছ। আমার উচিত ছিল দু'জনকে দাওয়াত দেয়া।

শায়লা বললেন, হারুনকে বলেছি। সাগরকেও যেন নিয়ে আসে। মনে হয় এনেছে।

দরজা খোলা হলো। হারুন সাহেব এক গোছা দোলনচাপা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে যে শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে সে দোলনচাপার চেয়েও সুন্দর।

শায়লা বললেন, আমার দুষ্ট বাবাটা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে মা'কে জড়িয়ে ধরল।

মিসির আলি বললেন, শায়লা! তোমার দুষ্ট বাবুটাকে একটু আমার কাছে আনো। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেই।